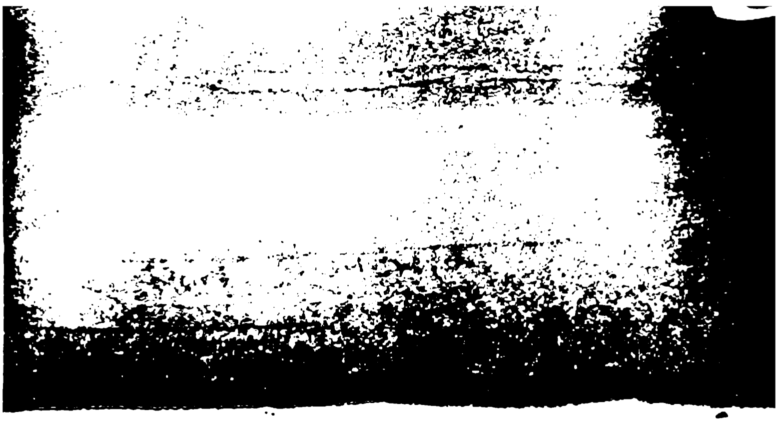

বাংলা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডক্টর মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত

# সাহিত্যিকী

দ্বিতীয় বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

বসন্ত ১৩৭১

প্রাপ্তিস্থান

বাংলা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

ফারুক লাইব্রেরী,
সাহেব বাজার
রাজশাহী।

দাম : আড়াই টাকা

হেমায়েত ইসলাম মেশিন প্রেস থেকে
খোন্দকার জসীমউদ্দীন কর্তৃক মুদ্রিত
ও
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ডঃ মযহারুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত

বিভাগ

# ভূমিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা-পত্র 'সাহিত্যিকী' বছরে দুই সংখ্যা প্রকাশ পাবে—বসন্ত ও শরৎ। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই দুটো ঋতু আমরা নির্বাচন করেছি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে নতুন তথ্য ও মৌলিক গবেষণা এবং আধুনিক সাহিত্য সংক্রান্ত সুচিন্তিত সমালোচনা এই পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হয়। দেশের সুবিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে লোক-সাহিত্যের যে টুকরো অংশগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে বিলীন হ'তে চলেছে, এ পত্রিকা সেগুলোর মূল্যবিচারের দিকেও বিশেষ যত্নবান।

দুঃখের বিষয়, গত ১৩৬৬ সালে (১৯৫৯ খ্রীঃ) 'সাহিত্যিকী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশ পাবার পর অপরিহার্য কারণবশতঃ এর প্রকাশনা স্থগিত হয়ে পড়ে। যাহোক, সমস্ত বাধা অপসারণ করে 'সাহিত্যিকী' আবার আত্মপ্রকাশ করলো। বর্তমান সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা হিসেবে পরিগণ্য। আশা করা যায়, এর পর থেকে এই গবেষণা-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ পাবে।

মযহারুল ইসলাম

বাংলা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩০শে চৈত্র, ১৩৭১।

## : সূচী :


পৃষ্ঠা

১ পাক-ভারতীয় লোকগল্পের একটি দিক : বোকা জামাতা ১

ডঃ মযহারুল ইসলাম

২ দোভাষী পুঁথির কবি সৈয়দ হামযা : ২৯

ডঃ গোলাম সাকলায়েন

৩ বাংলা 'সমালোচনা'র বিকাশে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র ভূমিকা : ৮৩

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়

৪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিক্রমা : ১১৩

মুহম্মদ আবুতালিব

# সাহিত্যিকী

দ্বিতীয় বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
বসন্ত—১৩৭১


## পাক-ভারতীয় লোকগল্পের একটি দিক : বোকা জামাতা


ডক্টর মযহারুল ইসলাম


আমাদের দেশে লোকসাহিত্য সম্পর্কে আবহমান কাল থেকে যে-ধারণা গ্রন্থ-প্রবন্ধাদিতে প্রমূর্ত তা আর যাই হোক, বৈজ্ঞানিক নয়। ইউরোপের স্ক্যাণ্ডা-নেভিয়ার চারটি দেশে, জার্মাণীতে এবং ইংলণ্ডে বিগত ও বর্তমান শতাব্দীদ্বয়ে যে-জাতীয় তুলনামূলক আলোচনা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা লোকলোরকে[১] কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা আমাদের দেশে শুধু অজ্ঞাত নয়, অকল্পনীয়। লোকলোর-এর গবেষণামূলক অধ্যয়নে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের। বিগত কয়েক দশকে এ দেশের কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতের আজীবন পরিশ্রম ও

---

১। Folklore শব্দটির বাংলা তর্জমা বর্তমান লেখকের মতে লোকলোর হ'তে পারে। ইংরেজী Folk শব্দটির অর্থ বাংলায় লোক। Lore শব্দটির প্রকৃত অর্থ Learning বা শিক্ষা। কিন্তু বাংলা শিক্ষা ইংরেজী Lore শব্দটির সার্থক অর্থবহ নয়—শিক্ষা শব্দটি অনেকটা উৎকর্ষদ্যোতক। লোকসংস্কৃতি বা লোক-পরিচয় ইত্যাদি শব্দ ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য, যে জন্য ইংরেজ মুলুকেও এক সময় Folklore ও Culture শব্দদ্বয় নিয়ে বাকবিতণ্ডা চলেছিল।

গবেষণার ফসলে লোকলোর কেন্দ্রিক অধ্যয়ন প্রভূত সমৃদ্ধিলাভ করেছে। ফলে, ইউরোপের স্ক্যাণ্ডানেভিয়ার চারটি দেশে, জার্মাণীতে ও যুক্ত আমেরিকায় লোকলোর এখন খেয়ালী সংগ্রাহকদের অলসভাবনা-চরিতার্থের ক্ষেত্র মাত্রে পর্যবসিত নয়— রীতিমত একটি Discipline রূপে স্বীকৃত। সেজন্যই আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর গোড়ায় সলজ্জ-পদচারণায় যেখানে লোকলোর বিব্রত সেখানে উক্ত দেশ সমূহের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই লোকলোর বিভাগ স্বমহিমায় সমুন্নত। লোকলোর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও গবেষণার দৌড় জনৈক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের ভাষায় যেভাবে বিশ্লেষিত তা

---

বস্তুত এ-দুটো শব্দেও Folklore এর সার্থক প্রতিরূপ বিম্বিত হয় না। লোক-সংস্কৃতি ইংরেজী Folk Culture এর অর্থ জ্ঞাপক। কোন কোন পণ্ডিত Folk lore শব্দকে বাংলায় লোকবিজ্ঞান বলে চালাতে প্রয়াসী। কিন্তু লোকবিজ্ঞান ইংরেজী Folk Science শব্দটিকে যেন স্মরণ করিয়ে দেয় যা Folklore এর একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। আমেরিকাতে Folk Science নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলেছে, লোক-ঔষধ (Folk medicine), লোক-চিকিৎসা (Folk treatment), বৃক্ষতরু সম্পর্কে লোক-অভিজ্ঞা, ইত্যাদি যার অঙ্গীভূত।

ইংরেজীতে Folklore শব্দটি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম জোন থম্পস নামক জনৈক ইংরেজ পণ্ডিত দ্বারা প্রবর্তনের পর থেকে এ-শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ বাকবিতণ্ডাময় ইতিহাস গড়ে উঠেছে। মতবিরোধ সত্ত্বেও Folklore শব্দের যে সংজ্ঞা প্রায় সর্বমতের সমন্বয় করেছে তা হোল— Learnings of the illiterate masses that passed from generations to generations through oral tradition. এই সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রেখে বোধকরি লোকজ্ঞান বা এই জাতীয় একটি শব্দ Folklore শব্দকে বোঝানোর জন্য বাংলায় ব্যবহৃত হ'তে পারে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের মতে লোকলোর শব্দটি যদি চালু করা চলে তবে উত্তম হ'বে। অবশ্যি শব্দটিতে ইংরেজী বাংলার খিচুড়ী আছে—কিন্তু খিচুড়ীতে আমরা কম অভ্যস্ত নই। যদি হেডপণ্ডিত, মাষ্টার-মশাই, ভিজিট বই, নোট বই, হাফ আখড়াই, হাফ হাতা, রেজিষ্ট্রিখাতা প্রভৃতি Prefix এবং লাল-পেনসিল, বেহেড, পাকাপাইন প্রভৃতি Suffix জাতীয় বা আরো এরকম কয়েক গণ্ডা শব্দ ইতোপূর্বে চালু হ'য়ে থাকে, তবে লোকলোর শব্দটিও চালু হ'বে বলে বিশ্বাস। হয়ত এর জন্য লোকলোরজ্ঞদের কিছুটা আঁথিলোর এর ঝক্কি নিতে হ'তে পারে। এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ সত্বরই প্রকাশের বাসনা বর্তমান লেখকের রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য—যদিও উক্তিটি কটাক্ষের মত শ্রুত, তবু নিঃসন্দেহে সত্যভাষণে চিহ্নিত : Even the Intellectual classes of Asia and the Middle East stay close to their folk-inheritance, the gulf between industrialized and traditional cultures has not yet riven their societies; the aspiring folklorists from Thailand, Pakistan, Indonesia, Egypt are usually informants as well as collectors.[২]

লোকলোর এর গবেষণা ও অধ্যয়ন-রীতিতে কথক ও সংগ্রাহকের ঊর্ধ্বে উঠতে গেলে যে তুলনামূলক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রয়োজন তা এখনো আমাদের অনায়ত্ব। শৈশব থেকে আমরা রূপকথা শুনে আনন্দলাভে অভ্যস্ত—অথচ সেই রূপকথা এবং সামগ্রিকভাবে লোকগল্পকে কেন্দ্র করে যে কি অপরিসীম পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিত হ'তে পারে তা ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকজন পণ্ডিত প্রমাণ করেছেন। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁদের দৃষ্টি থেকে আমাদের লোকগল্পও বাদ পড়েনি, বাদ পড়তেও পারে না—কেননা বিশ্বের লোক গল্পের রাজ্যে পাক-ভারত উপমহাদেশের অবদান বিশিষ্টতম। একসময়ে এই উপমহাদেশকে বিশ্ব-লোকগল্পের মাতৃভূমি (Motherland of World Folktales) বলা হোত। বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের গবেষণা-গ্রন্থ থেকে একটি উক্তি প্রসঙ্গত স্মর্তব্য :

During the second half of the nineteenth century, the Western scholars were continuously involved in arguments and counter-arguments over the richness of Indo-Pakistan culture, especially of Indo-Pakistan folktales. European scholars focussing their attention on this Sub-Continent propounded such conflicting views as the Indianist Theory of folktale origins, the solar theory of myth origins, and the linguistic theory postulating an Indo-European parent speech as the origin of most Western Asian and European languages. These theories, once espoused so enthusiastically, have subsided lost their followers, and left as their solid contribution only the widely accepted fact that although India is not the only source of international folktales

২। ডক্টর রিচার্ড, এম. ডরসন, ফোকলোর রিসার্চ এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড (ব্লুমিংটন, ইণ্ডিয়ানা, ১৯৬১) পৃ: ৩।

and myths, her contribution in originating folktales and myths is undoubtedly considerable.[৩]

আমেরিকাতে একটি মাত্র লোকগল্পকে কেন্দ্র করে গবেষণাগ্রন্থ রচিত হবার সূত্রপাত এখন সুবিদিত। কয়েক বছর পূর্বে সিন্দারেলা কাহিনীর বিশ্বব্যাপী বিস্তারকে অবলম্বন করে ডক্টরেট থেসিস লিখে এ-ধারার সূত্রপাত করেন ওয়ারেন ই রবার্টস্, যিনি এখন ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি লোকগল্প এ-জাতীয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। এমন কি Swan Maiden বা হংসপরী গল্পটির শাখা-প্রশাখা সারা বিশ্বে এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত যে এ সম্পর্কে একজনের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব বলে বিশ্বের সব মহাদেশ থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় পণ্ডিতদের নিয়ে একটি দল গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা চলেছে। আমাদের দেশেও বানর-বাদশাহ ( টাইপ ৪০২, এ ) কালো এবং সাদা পাত্রী বা পরিবর্তিত পাত্রী ( টাইপ ৪০৩ ), রাজকুমার পাখী ( টাইপ ৪৩২ ), নিরুদ্দেশ যাত্রা ( টাইপ ৪৬৫ এ ), বিশ্বস্ত বন্ধু ( টাইপ ৫১৬ ), সাহায্যকারী বালিকা ( টাইপ ৩১৩ এ ), শীত ও বসন্ত ( টাইপ ৫৬৭ ), তিন স্বর্ণ পুত্র ( টাইপ ৭০৭ ) প্রভৃতি এবং এই জাতীয় আরও অনেক লোকগল্প অবলম্বন করে অনুরূপ গবেষণা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এ-সমস্ত কাজের জন্যও অতীতের ন্যায় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের নেকনজরের ওপরেই আমরা নির্ভর করে নিশ্চিন্তে কালযাপন করছি।

ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পন্থায় ( Historic-Geographic Method ) এখন লোক-কাহিনীর ভ্রমণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব। এই Technical প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি কাহিনীর বিভিন্ন দেশের পাঠ বিচার করে মূল পাঠ আবিষ্কার করা যেতে পারে। লোক-কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনায় এই প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

অবশ্যি Motif Index of Folk-literature এবং The Types of the Folk Tale প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে এই তুলনামূলক আলোচনা বর্তমানে বহুলাংশে সহজ

---

৩। ডক্টর মযহারুল ইসলাম, এ হিষ্ট্রী অব ইংলিশ ফোকটেল কালেকসান ইন ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড পাকিস্তান ( ব্লুমিংটন, ইণ্ডিয়ানা ) ১৯৬৩।

সাধ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু তবু কাহিনীগুলোর বিভিন্ন পাঠের সাথে পরিচয় না থাকলে শুধু এই গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্যে কোন আলোচনাই সার্থকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। লোকগল্পের বোকাদের মধ্য থেকে একটির উপমা এখানে উল্লেখ করে ব্যাপারটি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন একটি লোক গাছের যে ডালে বসে সেই ডালই কাটতে শুরু করে। আমরা কালিদাস সম্পর্কে এমন একটি কিংবদন্তী জানি। কিন্তু এই গল্পের বিভিন্ন পাঠান্তর মিলবে পার্কার সাহেবের Village Folk-Tales of Ceylon গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায়, Dubois এর পঞ্চতন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদে ( ৩০৫ পৃষ্ঠায় ), উইলিয়ম গুনতিল্লকের "Sinhalese Folklore" প্রবন্ধে ( Orientalist, Vol. I, P. 121 ), ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে Folklore পত্রিকায় প্রকাশিত Lucas W. King এর "Punjub Folktales" গল্পে ( পৃঃ ২৬২ ), ডক্টর শ্যামা শংকরের Wit and Wisdom of India গ্রন্থে ( ৪৯-৫০ পৃষ্ঠায় ), Maive Stokes এর Indian Fairy Tales গ্রন্থে ( ৩০-৩১ ও ৪৭৫ পৃষ্ঠায় ), Charles Swynnerton সাহেবের Indian Nights Entertainment গ্রন্থে ( ৮৯ পৃষ্ঠায় ), The Adventure of the Punjub Hero Raja Rasalu সংকলনে ( ১৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় ), এবং Septimus Smelt Thorburn সাহেবের Bannu or Our Afgan Frontier গ্রন্থে ( ২০৬-৭ পৃষ্ঠায় )। পাকভারত উপমহাদেশের প্রতিনিধি স্থানীয় সবগুলো পাঠান্তরই এই সমস্ত গ্রন্থ-পত্রিকায় বিদ্যমান। এই গ্রন্থ-পত্রিকাগুলোর সাথে যাঁর নিবিড় পরিচয় নেই তিনি শুধু The Types of the Folk Tale গ্রন্থ দেখে টাইপ ১২৪০ নম্বর উদ্ধার করে তুলনামূলক আলোচনা সমাপ্ত করতে পারেন না। অবশ্যি আলোচ্য গ্রন্থ-পত্রিকাগুলো ইংরাজীতে প্রকাশিত—এ ছাড়াও পাকভারত উপ-মহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এ গল্পের শত শত পাঠান্তর খুঁজলে হয়তো মিলতে পারে। যিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে এই একটি গল্পের সম্ভাব্য সমস্ত প্রতিনিধিস্থানীয় পাঠ সংগ্রহ করতে সমর্থ হ'বেন এবং যিনি পাকভারতীয় ভাষাগুলোতে প্রকাশিত গ্রন্থ-পত্রিকা খুঁজে গল্পটির পাঠান্তর আবিষ্কারে যত্নবান হ'বেন তাঁর পক্ষেই গল্পটির পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক আলোচনা দাঁড় করানো সম্ভব। কিন্তু তেমন প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত এ দেশে গোচরীভূত হয় নি। অবশ্যি অনুরূপ প্রমাণের অভাবে আপাততঃ গল্পটির নির্ভরযোগ্য পাঠান্তরের জন্য আমাদের উল্লিখিত ইংরেজী গ্রন্থ-পত্রিকাগুলোর ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ-পদ্ধতি মন্দের ভাল এবং এর-সাহায্যে অনায়াসেই

আমরা দেখবো গল্পটি মোটামুটি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, পাঞ্জাবে, সিংহলে, মধ্যভারতে এবং পশ্চিমবাংলা অঞ্চলে বিশেষভাবে পরিচিত। পাকভারতীয় অনেক গল্পের মতই এ-গল্পেরও প্রাচীনতম লিখিত উৎস পঞ্চতন্ত্র ও পরবর্তীকালের কথাসরিৎ সাগর গ্রন্থদ্বয়ে নিহিত। অবশ্যি বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যেহেতু গল্পটির উৎসমূলে পঞ্চতন্ত্র রয়েছে সেই হেতু পাকভারত উপমহাদেশের পশ্চিম উত্তর, মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে গল্পটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং এই সমস্ত অঞ্চল থেকে এখনো প্রচুর পাঠান্তর সংগ্রহ করা সম্ভব। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ ভারতে গল্পটির ব্যাপক প্রচার না হ'লেও মলয়ালাম, তেলেগু, মারাঠী ও তামিল ভাষাগোষ্ঠীর লোকের মধ্যে গল্পটি হয়তো বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে থাকবে।

আলোচ্য পদ্ধতিরই অনুসরণের প্রয়াস বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বিদ্যমান। সৌভাগ্যক্রমে এযাবৎ পাকভারত উপমহাদেশের লোকগল্পের যতগুলো ইংরেজী সংকলন প্রকাশ পেয়েছে এবং ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় যে সমস্ত লোকগল্প প্রকাশিত হ'য়েছে সবই পুংখানুপুংখরূপে অধ্যয়নের সুযোগ প্রবন্ধ লেখকের হ'য়েছিল। সে কারণেই কাহিনী-গুলোর পাঠান্তর ও এলাকা যথাসাধ্য উল্লেখ করা তার পক্ষে সহজসাধ্য হ'য়েছে। অবশ্যি গ্রন্থ-পত্রিকা ছাড়া তার নিজস্ব সংগৃহীত গল্প থেকেও কিছু কিছু পাঠান্তর সংযোজিত হ'য়েছে। কিন্তু তবু স্বীকার্য এ-জাতীয় লোকগল্প সমগ্র পাকভারত উপমহাদেশের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই গ্রামে, বন্দরে অসংখ্য ছড়িয়ে রয়েছে এবং সেগুলো সংগৃহীত হ'লে প্রবন্ধটি আরো সুন্দর ও সমৃদ্ধ হোত। কিন্তু সে সম্ভাবনার প্রকৃষ্ঠ ক্ষেত্র একটি প্রবন্ধ না হ'য়ে গ্রন্থ হ'লেই উত্তম হ'বে এই ভরসায় ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করা যাক। ইংরেজী Folkatale শব্দটিকে অনেকেই লোকশ্রুতি, লোক-কথা বা লোক-কাহিনী হিসেবে অনুবাদ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের মতে লোকগল্প বা লোক-কাহিনী শব্দদ্বয় Folktale শব্দটির সমধিক নৈকট্য লাভে সমর্থ। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে যে জাতীয় কাহিনীর প্রাধান্য সে গুলোকে লোকগল্প বলাই অধিক সঙ্গত বলে প্রবন্ধের সর্বত্র লোকগল্প শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়েছে।

পাক ভারতীয় লোক-কাহিনীতে Jokes and Anecdotes এর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বিশ্বের লোক-কাহিনী রসিকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। আর আশ্চর্যের বিষয়, এই লোক-গল্পের অধিকাংশেই বুদ্ধিবিহীন কার্যকলাপের নায়ক জামাতা। আলোচ্য প্রবন্ধে অনুরূপ বোকা জামাতাদের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজনের উল্লেখ করে

দেখানো হ'য়েছে সারা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কি ভাবে সাধারণ লোকেরা বোকা জামাতাদের কার্যকলাপে রস-কৌতুক উপভোগ করে থাকে। উল্লেখ্য যে সারা উপমহাদেশেই এ-জাতীয় গল্প জনপ্রিয়। নিশ্চয়ই উল্লিখিত গল্পগুলোতে বিম্বিত জামাতারা ছাড়াও আরও বহু ধরণের বোকা জামাতার পরিচয় আমাদের দেশে বা পাকভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু বলাই হয়েছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের পুঁজি তার নিজের কিছু কিছু সংগ্রহ এবং এ যাবৎ প্রকাশিত পাকভারতীয় লোকগল্পের ইংরেজী সংকলনগ্রন্থ সমূহ ও ইংরেজী পত্র-পত্রিকা। তা ছাড়া প্রবন্ধের কলেবরের দিকে লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করবার দৃষ্টিও প্রবন্ধে অনুপস্থিত নয়।

বিশ্বের সব দেশের লোক-গল্পেই জামাতা শাশুড়ির অবৈধ সম্পর্ক-জ্ঞাপক বা অবৈধ সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত-বাচক লোকগল্প আছে। Mother-in-law এবং Sister-in-law incest অনেক দেশের উপজাতীয় এলাকায় কিংবা অনুন্নত অরণ্যচারী সম্প্রদায়ের মধ্যে অপরিজ্ঞাত নয়। পাক-ভারত উপমহাদেশের লোকলোরে এর প্রচুর নিদর্শন উপস্থিত। জামাতা-শাশুড়ির সম্পর্ক নিয়েই জামাতাকে বোকা প্রতিপন্ন করবার প্রচেষ্টা পাক ভারতের বহু লোকগল্পে বিধৃত। বোকা জামাতাদের পরিচয়ের প্রারম্ভেই বাংলা ভাষায় প্রচলিত লোকগল্প থেকে প্রমাণোল্লেখ বিধেয় বিবেচিত হবে। অবশ্যি লোকগল্পটি অনুন্নত রুচির পরিচয়-বহ। শাশুড়ির চুলোয় দুধের পাতিলে দুধ উথলিয়ে উঠছে, শাশুড়ি নাড়ন দিয়ে নাড়তে ব্যস্ত ; অন্যদিকে বেড়ার সাথে শুকোতে দেয়া রয়েছে শাশুড়ির কাপড়। এমন সময় ঝড় এ'লো। শাশুড়ীর একার পক্ষে দুধ নাড়া এবং কাপড় তোলা সম্ভব হচ্ছে না, জামাতার সহায়তা প্রয়োজন। জামাতাকে প্রশ্ন করা হোল, সে কোন কাজটি করবে, শাশুড়ীর দুধ নাড়বে না তার কাপড় তুলবে। বলাবাহুল্য অবিকল এই ভাষায় এ কাজের যে কোন একটির সমর্থন জামাতার পক্ষে বোকামীর নামান্তর। পল্লীবাংলায় এ জাতীয় প্রশ্নে জামাতাকে বোকা সাব্যস্ত করবার প্রয়াস সর্বজনবিদিত।

॥ বোকা ঘরজামাতা ॥ শুধু প্রশ্নোত্তরে নয় কার্য্যকলাপেও পাকভারতীয় লোকগল্পে এ-জাতীয় বহু সংখক বোকা জামাতার পরিচয় আছে। আর এই বোকা জামাতাদের অনেকেই বিধবা অথবা সধবা শাশুড়ীর বাড়ীতে আশ্রিত, অর্থাৎ সহজ

বাংলায় এরা ঘর জামাতা। গৃহাশ্রিত জামাইয়ের শিক্ষাগর্বে গর্বিতা শাশুড়ি তার আত্মীয়াদের ডেকেছে জামাইয়ের কেতাব পড়া শুনতে। জামাই কেতাব খুলে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে থাকলো, কেননা তার আশৈশব পরিচিত কেতাবের বিরাট অক্ষরগুলো না খেতে পেয়ে এমন খর্বাকৃতি ধারণ করেছে যে চোখে পড়তে চায় না (মটিফ. জে. ১৭৪৬.১)। গল্পটি শুধু যে উত্তর ভারতের কুমাউন অঞ্চলে পরিচিত এমন নয়, বাংলা ভাষায়ও বহুলোকবিদিত।

দক্ষিণ বাংলার[৪] লোকগল্পের একজন বোকা মানুষ রাত্রে ফসল পাহারা দেবার সময় একটি স্বর্গীয় হাতীর (কোন কোন ক্ষেত্রে শিবের ষাঁড়) লেজ ধরে ঝুলে পড়ে এবং অবশেষে আকাশে উপস্থিত হয়। স্বর্গ ভ্রমণ শেষ করে পরদিন আবার সে সেই হাতীর লেজ ধরে গ্রামে ফিরে আসে। তার গল্প শুনে গ্রামের উৎসাহী যুবকেরা তার সঙ্গ নিয়ে আকাশ ভ্রমণে যাবার অদম্য বাসনা প্রকাশ করে। পরবর্তী রাত্রে সবাই সেই স্বর্গীয় হাতীর লেজ ধরে ঝুলে পড়ে। কিন্তু ঝুলন্ত লোকের লাইনে প্রথম হাতীর লেজ ধারণ করেছিল সেই ফসল পাহারাদার। মাঝপথে ঝুলন্তদের একজন পাহারাদারকে প্রশ্ন করে স্বর্গ কেমন দেখতে। সে তার স্বাভাবিক অভ্যাসানুযায়ী হাত নেড়ে তার প্রশ্নের জবাব দিতে যেয়ে সমগ্র লোকসহ ভূপতিত ও লোকান্তরিত হয়। দক্ষিণ বাংলার এই লোকগল্পের পাহারাদার মধ্য বাংলার গল্পে বোকা ঘরজামাতা। গল্পটি কথা সরিৎ সাগরে আছে[৫]। কবিগুরুর স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্রী শোভনা দেবী গল্পটি কলিকাতার উপকণ্ঠ থেকে সংগ্রহ করেন[৬]। জোড়হাট অঞ্চলেও গল্পটি সুপরিচিতি।[৭] গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগ্রহেও গল্পটির-একটি পাঠান্তর স্থান পেয়েছে।[৮]

---

৪। ডব্লিউ, মেক কুল্লক—বেঙ্গলি হাউসহোল্ড টেল্‌স্, লণ্ডন, ১৯১২, পৃঃ ১৪৩-১৪৭।

৫। সি, এইচ, টাউনে,—কথা সরিৎ সাগর, কলিকাতা। ওসান অব দি ষ্ট্রীমস অব ষ্টোরী, ১৮৮০-৮৪, ২য় খণ্ড।

৬। দি অরিয়েন্ট পার্লস, লণ্ডন, ১৯১৫, পৃঃ ৪৯-৫২।

৭। এস. সি. দাস, মোর দেশের সাধু কথা, ১৯৩৯, পৃঃ ১০৮-১১২।

৮। জি, এ, গ্রিয়ারসন, লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ৫ম খণ্ড (২), পৃঃ ১৬১।

এ গল্প যে সিংহল অঞ্চলেও সুবিদিত পার্কার সাহেবের সংগ্রহ থেকে তা জানতে পারা যায়।[৯] গল্পটি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে ১২৫০ সি টাইপভুক্ত।

ঝুলন্ত অবস্থায় হাত ছেড়ে বোকা বনে যাবার আরো অনেক রকমের লোকগল্প বাংলা ভাষায় সুবিদিত। প্রসঙ্গতঃ একটি কাহিনীর উল্লেখ করা চলে। একই পাড়ার দুইজন ঘর জামাতা গ্রীষ্মকালে আমগাছে দোল খেলবার ব্যবস্থা করে। এদের একজন গাছের শাখা ধরে এবং অপরজন সেই ঝুলন্ত ব্যক্তির পা ধরে ঝুলতে থাকে। শাখাধারী ব্যক্তি চরণধারীকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করে। গান শুনে শাখাধারী ব্যক্তি অভিভূত হয়ে হাত তালি দিতে থাকে। এর ফল যে কিরূপ হয়েছিল তা অনুমেয়। শ্যালকরা এ দৃশ্য দেখে দুই জামাতাকে কম নাজেহাল করে নি ( মটিফ জে ২১৩৩'৫'৩ )। গল্পটি ফ্রান্সিস ব্রাডলে-বার্ট সাহেব[১০] বাংলাদেশ থেকে এবং এইচ, থিও, টরেণ্টে[১১] সাহেব ছত্রিশ গড় থেকে সংগ্রহ করেন। এ গল্পের একটি ইংরেজী অনুবাদ North Indian Notes and Querries ( London, 1891-96 ), পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যায় ( পৃঃ ২৪৯ ) বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের পড়বার সুযোগ হয়েছিল।

গাছের শাখায় বসে সেই শাখা কাটবার গল্প পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে—গল্পটি যে সারা উপমহাদেশে পরিচিত তাও বলা হয়েছে। এই গল্পের সাথেই আরও ঘটনা যুক্ত হয়ে আর একটি বেশ মজার গল্প সৃষ্টি হয়েছে এবং সে গল্পও পাকভারত উপমহাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। একজন পথিক পথে একজন লোককে করাত দিয়ে যে শাখায় বসে আছে সেই শাখা কাটতে দেখে তাকে সাবধান করে যে ডালটি কাটলে সে নীচে পড়ে যাবে। লোকটি পথিকের সাবধান বাণী না শুনে ডালটি কাটে এবং ভূপতিত হয়। পথিকের ভবিষ্যৎবাণী এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে দেখে লোকটি ভাবে পথিক নিশ্চয়ই পয়গম্বর। সুতরাং সে পথিককে অনুসরণ করে এবং কবে সে মারা যাবে এ ভবিষ্যৎ গণনা করতে মিনতি জানায়। পথিক লোকটির বুদ্ধির দৌড় বুঝতে

---

৯। হেনরী পার্কার, ভিলেজ ফোকটেল্‌স অব সিলোন, লণ্ডন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০৭-৯, ও ২১০-২১১।

১০। বেঙ্গল ফেয়ারী টেল্‌স, লণ্ডন, ১৯২০, পৃঃ ১৫-১৬।

১১। ফোকটেল্‌স অব ছত্রিশগড়, নিউইয়র্ক, ১৯৩৮, পৃঃ ৫৫।

পেরে বলে "যখন তোমার হাত পা খুব ঠাণ্ডা হবে, মনে করবে তুমি মৃত।" ঘটনাক্রমে এক শীতের সকালে ঠাণ্ডা পানিতে অবগাহনের পর সে অনুভব করে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে এবং সে এখনি মৃত হয়ে পড়বে। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন সৈনিক সেই পথ দিয়ে যেতে ভুল করে এবং এই ব্যক্তিকে পথের সন্ধান জিজ্ঞেস করে। লোকটি অকপটে বলে "আমি যখন জীবিত ছিলাম তখন অমুক পথ ধরে অমুক স্থানে যেতাম।" সৈনিকরা এ কথা শুনে লোকটিকে ধরে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে লোকটির নির্দেশিত পথেই চলে যায়। লোকটি রাত্রে ফিরে এসে তার বন্ধুদের সাবধান করে মৃত্যুর পর তারা যেন সৈনিকদের অবশ্যই এড়িয়ে চলে, কেননা তারা অযথা মৃত লোকদের শাস্তি দেয়। বাংলা লোকগল্পের এই লোক কোন কোন ক্ষেত্রে ঘরজামাতা। কাশীন্দ্র নাথ ব্যানার্জী[১২], ব্রাডলী-বার্ট সাহেব[১৩] বাংলা দেশ থেকে, সি. ডি. বিউভয়ের ষ্টোক্স সাহেব[১৪] লেপচাদের মধ্য থেকে, স্যান্নার্টন[১৫] সাহেব উত্তর সিন্ধু প্রদেশ থেকে, থোরবার্ন সাহেব[১৬] সীমান্তের পাঠানদের নিকট থেকে, এল. ভি. কিং সাহেব[১৭] পাঞ্জাব থেকে, ডব্লু. এফ. ও কন্নর সাহেব তিব্বত থেকে এবং পার্কার সাহেব[১৮] সিংহল থেকে গল্পটির পাঠ সংগ্রহ করেন। গল্পটির মূল উৎস নিঃসন্দেহে পঞ্চতন্ত্র। পাকভারতীয় বিখ্যাত Numskull story গুলোর মধ্যে গণনায় নিজেকে বারবার বাদ দেয়া জাতীয় টাইপ (টাইপ ১২৪১) বহুল-প্রচারিত। গল্পটির সমস্ত পাঠান্তরেই তিন বা একাধিক বোকার ভূমিকা—কিন্তু দুই একটি মৌখিক ঐতিহ্যে তিনজন বোকাই এক গ্রামের

১২। পপুলার টেল্‌স অব বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯০৫, পৃঃ ১৮৭-১৯৬।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬-১০।

১৪। "Folklore & Customs of the Lap-chas of Sikhim" JPAS Beng. (n. s.) XXI, 457-458.

১৫। চার্লস স্যান্নার্টন, ইণ্ডিয়ান নাইট্‌স্ এণ্টারটেইনমেণ্ট, লণ্ডন ১৮৯২, পৃঃ ৪৯।

১৬। স্কেট সেপটিমাস থোরবার্ণ, বান্নু অর আওয়ার আফগান ফ্রন্টিয়ার, লণ্ডন, ১৮৭৬, পৃঃ ২০৬-২০৭।

১৭। "The Tales of the Punjab, Folk-Lore, XXXVI, 262-63.

১৮। প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫।

ঘরজামাতা। বিখ্যাত লোকলোরজ্ঞ ও পুরাতত্ত্ববিদ ভি, এলউইন[১৯] ও ভাষাবিদ গ্রীয়ার্সন সাহেব[২০] তাঁদের দুইটি অনবদ্য গ্রন্থে এ গল্পের উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও আসামাঞ্চল থেকে আণ্ডারসন[২১], কাশ্মীরাঞ্চল থেকে নোয়েল্স[২২], ডব্লু, এইচ রীভার্স সাহেব[২৩] দক্ষিণ ভারতে টোডাদের মধ্য থেকে, পণ্ডিত গঙ্গাদত্ত উপ্রেতী মহাশয় কুমায়ুন ও গারহোয়াল অঞ্চল থেকে[২৪], স্যান্নাটর্ন[২৫] সাহেব উত্তর সিন্ধু থেকে, এস, সি, মিত্র মহাশয়[২৬] বিহারাঞ্চল ও পার্কার সাহেব[২৭] সিংহল থেকে এ গল্পের পাঠ সংগ্রহ করেছেন। সুইডেনের বিখ্যাত পণ্ডিত লুরিস বোডকার ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গল্পটিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটি বিশেষ ধারার অন্তর্ভুক্ত করেন[২৮]।

আমাদের পাহাড়িয়া অঞ্চলের জনৈক লুসাই ঘরজামাতাকে তার শাশুড়ী কড়াইয়ে মাছ ভাজা যাতে পুড়ে না যায় তা দেখতে আদেশ করে। একটি মাত্র মাছই কড়াইয়ে ছিল—কিন্তু উত্তপ্ত তৈলে প্রলম্ফিত মাছটিকে অনেকগুলো মনে করে জামাতা সেটি তুলে ভক্ষণ করে। শাশুড়ী ফিরে এলে তার আর জবাব দেবার কিছু থাকে না।

---

১৯। ফোকটেল্স অব মহাকোশল, নিউইয়র্ক, ১৯৪৪, পৃ: ১০৯।

২০। বিহার পিজেন্টেস লাইফ, পাটনা, ১৯২৬, পৃ: ৬৯।

২১। জে, ডি, এ, আণ্ডারসন, এ কানেক্সন অব কাচারী ফোকটেল্স এণ্ড রাইম্স, শিলং ১৮৯৫, পৃ: ৪২-৪৩।

২২। জে এইচ, নোয়েল্স, ফোকটেল্স অব কাশ্মীর, লণ্ডন, ১৮৯৩, পৃ: ৩২২-৩২৩।

২৩। দি টোডাস, লণ্ডন, ১৯০৬, পৃ: ১৯৯।

২৪। প্রোভার্বস এণ্ড ফোকলোর অব কুমায়ুন এণ্ড গারহোয়াল, লুধিয়ানা, ১৮৯৪, পৃ: ৭৪-৭৫।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৫-৭।

২৬। জার্নাল অব এনথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি, বোম্বে, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩২২-৩২।

২৭। প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫৮।

২৮। ইণ্ডিয়ান এনিম্যাল টেল্স, FFC 170, Helsinki, 1957, no, 1074.

পাঞ্জাব থেকে সংগৃহীত স্যান্নার্টন সাহেবের একটি লোকগল্পের জনৈক বোকা[২৯] ছাগলের পায়খানাকে ফল মনে করে আহার করেছে ( মটিফ জে ১৭৬১.১১ )। বাংলায় প্রচলিত লোকগল্পের কোন কোন কাহিনীতে এই বোকা লোকটি ঘরজামাতা। বোকা জামাতাকে নিয়ে বিব্রত শাশুড়ী ঘরজামাতাকে হাটে পাঠানোর সময় বলে দিয়েছে, "এনো কিছুমিছু"—সুতরাং জামাতা হাটে যেয়ে প্রত্যেক দোকানে জিজ্ঞেস করেছে কিছুমিছু আছে কিনা ( মটিফ জে ১৮০৫.৪ )। গল্পটি এ দেশে সুপরিচিত। হিমালয় অঞ্চল থেকে ইউরোপীয় লোকলোরজ্ঞ মিনিভীম সংগৃহীত একটি গল্পেও অনুরূপ কাহিনী বিদ্যমান[৩০]। জনৈক ঘরজামাতা তার শাশুড়ীর ভগ্নীর ( অথবা জাএর ) ঘ্যাগ সারাবার প্রতিশ্রুতি করে ঘ্যাগে লাঠি দিয়ে আঘাত করে, ফলে তার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে ( মটিফ জে ১৮৪৭ )। জামাতার এমন কাজের পেছনে অভিজ্ঞতা হোল উটের গলায় কোন এক সময় তরমুজ আটকে গেলে এভাবেই সে তার অপসারণ করেছিল। গল্পটির একটি কাহিনী স্যান্নার্টন সাহেবের পাঞ্জাবী গল্প-সংগ্রহে[৩১] স্থান পেয়েছে। ঠিক অনুরূপ একজন ঘরজামাতা পূর্ব-পাকিস্তানেও বিশেষ পরিচিত। রৌদ্র-উত্তপ্ত লোহার কাঁচি পানিতে ভিজিয়ে ঠাণ্ডা করবার অভিজ্ঞতা থেকে জনৈক ঘরজামাতা ( অথবা কৃষক ) তার বৃদ্ধা জ্বরাক্রান্ত শাশুড়ীকে ( অথবা মা কিংবা বোন ) পানিতে ডুবিয়ে রোগমুক্ত করবার চেষ্টা করে তাকে চিরতরে ঠাণ্ডা করেছে ( মটিফ জে ২২১৪.৯, জে ২৪১২.৬ ; আরনে-থম্পসন টাইপ ১৩৩৮ )। গল্পটি সাঁওতালদের মধ্যে[৩২], সিংহলে[৩৩] এবং পাঞ্জাবেও[৩৪] পরিচিত।

---

২৯। চার্লস স্যান্নার্টন, দি এডভেঞ্চার অব দি পাঞ্জাব হিরো রাজা রাসালু, ( কলিকাতা, ১৮৮৪ ). পৃঃ ১৬৭।

৩০। ইজ্ভেজ্কিয়া কাস্কি ই লিজেণ্ডী ( সেণ্ট পিটার্সবার্গ, ১৮৭৬ )। পৃঃ ১৯।

৩১। চার্লস স্যান্নার্টন। ইণ্ডিয়ান নাইট্স্ পৃঃ ৩০৭।

৩২। পল অলাফ বোর্ডিং। সাওতাল ফোক টেল্স্ ( অসলো এণ্ড ক্যামব্রিজ, মাস্যাচ্, ১৯২৬ )। ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩-২৭৫।

৩৩। হেনরী পার্কার। প্রাগুক্ত। ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮

৩৪। স্যান্নার্টন। ইণ্ডিয়ান নাইট্স্. পৃঃ ৮৩-৮৪

মধ্যভারতের একটি লোক গল্পের[৩৫] জনৈক বোকা গাড়োয়ান গরুর গাড়ীর কঁ্যা কঁ্যা শব্দ থেমে যাওয়ায় গরুরগাড়ীর মৃত্যু ঘটেছে এই ভেবে যাত্রীদের বিপদ ঘটিয়ে গাড়ীটিকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে ( মটিফ-জে ১৮৭২.০.১ )। বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের অধুনা সংগৃহীত একটি বাংলা লোকগল্পের এই গাড়োয়ান ঘরজামাতা এবং যাত্রী শাশুড়ী স্বয়ং। এই জাতীয় অপর একজন ঘরজামাতা তার স্ত্রীর মৃত্যুর পথ সুগম করেছিল। স্ত্রীর পায়ের আলতা যাতে নষ্ট না হয় এজন্য শাশুড়ী ( অথবা শ্বশুর ) জামাতাকে উপদেশ দিয়েছিল। সুতরাং রাস্তায় রওয়ানা হয়ে যখন কিছু অংশ পানি ভেঙ্গে যেতে হয়েছিল তখন জামাতা তার স্ত্রীর পা দুটো আকাশ মুখে তুলে ধরে পার হয়েছিল—স্ত্রীর কান্না বা চীৎকারের দিকে সে কর্ণপাত করেনি। ফলে পার হয়ে এসে দেখে স্ত্রীর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে ( মটিফ-জে ২৪৮৯.১১ ; তুঃ মটিফ-জে ১৯১৬ )। গল্পটি পঞ্চতন্ত্রে আছে এবং সেই সূত্র থেকেই বাংলা ভাষায়ও বহুল-প্রচলিত। বিখ্যাত ইউরোপীয় লোকলোরজ্ঞ বোডিং এ গল্প সাঁওতালদের মধ্য থেকেও সংগ্রহ করেছেন[৩৬]। মনে করা যেতে পারে গল্পটি দ্রাবিড় জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং সেখান থেকেই আর্য সমাজে অনুপ্রবেশ করে। এ জাতীয় আর দুজন ঘরজামাতার কথা উল্লেখ করে প্রসঙ্গের ছেদ টানা উচিত হবে। দুজনেই পাঞ্জাব-কাশ্মীর অঞ্চলের পাথুরে বুদ্ধির প্রতীক। এদের একজন শাশুড়ীর রান্নাঘর থেকে লবণের পাতিল মাঠে নিয়ে জমিতে লবণ ছড়ায়, কেননা তার ধারণা এ থেকে লবণের ফসল ফলবে ( মটিফ-জে ১৯৩২.৩ )[৩৭]। আর অপরজন মুরগী অথবা ছাগলের হাড় মাটিতে বপন করে এই ভরসায় যে মাটি থেকে প্রাণী আবার জন্মাবে ( মটিফ-জে ১৯৩২.৪.২ )[৩৮]।

---

৩৫। টেইলর সুসেট এম। "ইণ্ডিয়ান ফোক টেল্স্." ফোকলোর, ৬ ( ১৮৯৫ ), ৪০৬।

৩৬। বোর্ডিং। সান্তাল ফোক টেল্স্., ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭।

৩৬। সেসিল হেনরী বম্পাস্। ফোকলোর অব দি সান্তাল পরগণাজ ( লণ্ডন, ১৯০৯ )। পৃঃ ৩৫৩।

৩৭। ডক্টর নরম্যান ব্রাউন। "টাওয়ী টেল্স্." ম্যানুসক্রিপ্ট, ইণ্ডিয়ানা ইউনির্ভারসিটি লাইব্রেরী, নং ৩৬।

৩৮। রিচার্ড কারনাক টেম্পল এণ্ড ফ্লোরা এ্যানি ষ্টীল। ওয়াইড এ্যাওয়েক ষ্টোরিজ ( বোম্বাই, ১৮৮৪ )। পৃঃ ২০৬।

॥ পেটুক জামাতা ॥ শাশুড়ীর হাতের রান্না খাবার আকর্ষণ কোন জামাতার না হয়। বাংলা এবং পাকভারতীয় অন্যান্য ভাষায় শাশুড়ীর হাতের রান্না খাওয়া নিয়ে অনেক বোকা জামাতার সৃষ্টি হয়েছে। এ গল্পগুলোর মধ্যে অসমীয়া ভাষায় প্রচলিত একটি গল্প খুবই উপভোগ্য। শ্বশুর বাড়ীতে যেয়ে জামাতা কচি বাঁশের তরকারী খেয়ে সলজ্জে জিজ্ঞেস করে জেনেছিল, তরকারী আর কিছু নয় বাঁশ। সুতরাং রাত্রে যখন সবাই ঘুমাচ্ছন্ন তখন সে ধীরে ধীরে উঠে ঘরের বাঁশের দরজাটি খুলে নিয়ে রাতারাতি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং স্ত্রীকে অবিলম্বে বাঁশের দরজা কেটে তরকারী পাক করতে আদেশ করে। দেখে শুনে স্ত্রী বেচারার তো আক্কেল গুড়ুম। জনৈক বাঙ্গালী জামাতা অবশ্যি তার আসামী ভ্রাতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। খুব সুস্বাদু খাবার যখন তার শাশুড়ী খেতে দিয়েছে তখন বেশী খায়নি, কেননা শেষে শাশুড়ী মনে করতে পারে জামাই সাংঘাতিক পেটুক। কিন্তু রাত্রে যখন সবাই ঘুমাচ্ছন্ন তখন সে ধীরে ধীরে পাক ঘরে গিয়ে পাতিলে মুখ ঢুকিয়ে খাওয়া আরম্ভ করে। শব্দ শুনে সবাই জেগে যায়। এদিকে বেচারা জামাই তাড়াহুড়ো করে ছুটতে গিয়ে মাটির পাতিল ভেঙ্গে পাতিলের গলা তার গলায় আটকে যায়। এরপর জামাতার অবস্থা কি হয়েছিল তা অনুভব্য। জনৈক পাঞ্জাবী এবং পাঠান জামাতা কিন্তু রাত্রে উঠে এভাবে খেতে গিয়ে গলায় ডিম আটকে কোঁত কোঁত করতে থাকে। ওদিকে শাশুড়ী জামাতাকে দেখে ভেবেছে, জামাতার না জানি কি হয়েছে—সাথে সাথে সে ডেকেছে ডাক্তার। ডাক্তার এসে ভেবেছে বোধকরি জামাতার গলায় ফোঁড়া হয়েছে। সুতরাং বিলম্ব না করে অস্ত্রোপচার করেছে এবং ফলে যে কি অঘটন ঘটেছে তা সহজেই অনুমেয়[৩৯] (মটিফ-জে ৩১২.৪ ১ ; টাইপ ১০৩২ বি)।

পেটুক জামাতাদের মধ্যে আরো দুজনের বোকামী এখানে উল্লেখ্য। এদের একজন বাঙ্গালী অপরজন মধ্যভারতীয়। বাঙ্গালী জামাতাটি শাশুড়ীর হাতে দই খেয়ে ভেবেছে নিশ্চয়ই গাভী থেকে দধির জন্ম। সুতরাং গাভীর ওপর সে আরম্ভ করে অত্যাচার যাতে সে দই দান করে[৪০] (মটিফ-জে ১৯০৫ ৫)। মধ্যভারতীয় জামাতাটি

---

৩৯। স্যাম্যার্টন। ইণ্ডিয়ান নাইট্‌স, পৃঃ ৬৫-৭৮।

৪০। ফ্রান্সিস ব্রাডলে-বার্ট। প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫।

গাভী থেকে দুধ আসে দেখে ভেবেছে গাভীর ভিতরে না জানি কত দুধ রয়েছে। সুতরাং সে গাভীটিকে মেরে ফেলেছে সমগ্র দুধটুকু পাবার আশায়[৪১] (মটিফ-জে ১৯০৫ ৬)। জনৈক কাশ্মিরী জামাতা অবশ্যি শ্বশুর বাড়ীতে যেয়ে পিঠা খেতে খেতে সাতটি পিঠাই খেয়ে ফেলে। সর্বশেষের সপ্তম পিঠাটিই তার সর্বাপেক্ষা স্বাদ লাগে। সুতরাং সে আফসোস করে আহা, সপ্তম সংখ্যা যদি প্রথম সংখ্যা হোত[৪২] (মটিফ-জে ২২১৩৩)। এই জাতীয় জনৈক বাঙ্গালী জামাতা প্রথম সন্তানের জন্ম বার্তা পেয়ে শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। ক্রন্দনরত সন্তানকে কোলে নিয়ে বহু চেষ্টা করেও সে তার কান্না থামাতে পারে না। এ সময় তার স্ত্রী এসে সন্তানকে স্তনদান করবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান শান্ত হয়। এ দৃশ্য দেখে বেচারা নিজকে সামলাতে পারে না। সেও স্ত্রীর অপর স্তনে দুগ্ধপানে ব্রতী হয়। গল্পটি অবশ্যি পঞ্চতন্ত্রে আছে এবং খুব সম্ভব বাংলা গল্পের উৎস পঞ্চতন্ত্র। সাঁওতালদের মধ্যে গল্পটি একটু অন্য আকৃতিতে প্রচলিত। স্বামী মনে করে নারীদুগ্ধ শিশুর জন্য সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। সুতরাং সেও তার স্ত্রীর দুগ্ধ পান করা আরম্ভ করে যার ফলে সন্তানকে থাকতে হয় অনাহারে[৪৩] (মটিফ-জে ২২১৪.৪)। আর একজন সাঁওতালী পেটুক জামাতা বা স্বামী শাশুড়ীর (অথবা স্ত্রীর) রান্নায় এমন মুগ্ধ যে খাবারের কথা শুনলে তার বিচার বুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পায়। "পেছনে কে, পেছনে কে" জামাতার (বা স্বামীর) এই প্রশ্নের জবাবে শাশুড়ী (বা স্ত্রী) বলে যে পেছনে যা ছিল তা সে পাক করেছে। বেচারা তৎক্ষণাৎ পেছনে ফিরে দেখে যে দরজা এবং মনে করে নিশ্চয়ই এটা পাক করা হয়েছে। সুতরাং সে দরজাটিকেই কামড়িয়ে খেতে চেষ্টা করে[৪৪] (মটিফ-জে ২৪৮৫)।

॥ অন্ধ উপদেশানুসারী জামাতা ॥ এক জাতীয় জামাতার চিত্র পাক ভারতীয় লোকগল্পে প্রায়ই পাওয়া যায় যারা উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। বিয়ের

---

৪১। এম. এন, ভেনকটস্বামী। ইণ্ডিয়ান এনটিকুয়ারী। ৩০ (১৯০১), ৩০০।

৪২। নোয়েল্‌স। ফোক টেল্‌স্ অব কাশ্মীর, পৃঃ ৩২২।

৪৩। বোম্পাস। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫২।

৪৩। বোর্ডিং। সান্তাল ফোক টেল্‌স্। ২য় খণ্ড, ৮৭ পৃঃ থেকে।

৪৪। বোম্পাস, ইবিড, পৃঃ ৩৪৫ ; বোডিং, ইবিড, ২৭ পৃঃ থেকে।

পর প্রথম শ্বশুরালয়ে যাবার প্রাক্কালে আত্মীয় স্বজন জামাতাকে বলে দিয়েছে সে যেন সব সময় উচ্চাসনে বসে। সুতরাং জামাতা শ্বশুরালয়ে যেয়ে ঘরের ছাদে উঠে বসে আছে[৪৫] (টাইপ-১৬৮৫ বি)। জামাতাটি অবশ্যই পূর্বভারতীয় ব্যক্তি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীও। এ জাতীয় একজন পাঠান জামাতা স্ত্রীকে বড় পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছিল, কেননা শ্বশুরালয়ে যাবার প্রাক্কালে ভ্রাতৃবধূরা তাকে বলে দিয়েছিল সে যেন স্ত্রীর গায়ে সআহ্লাদে খুব ছোট মাটির ঢিল, পানির ছিটা অথবা গহনার পাথর ছুঁড়ে মারে[৪৬] (টাইপ ১৬৮৫)। দুজন বাঙ্গালী জামাতার কথা প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়। এদের একজনকে প্রথম শ্বশুরালয়ে যাত্রার সময় মা বোনেরা বলে দিয়েছে সে যেন কোকিলের মত মিষ্টি সুরে কথা বলে। সুতরাং শ্যালক শ্যালিকা যখন তাকে অভ্যর্থনা করলো সে মাঝে মাঝে কুহু কুহু এবং মাঝে টুউ টুউ করে ডাকতে শুরু করেছিল। অপরজন বন্ধুবান্ধবের কাছে শিখেছে লোকের সাথে কথাবার্তার প্রারম্ভে জিজ্ঞেস করতে হয় তার নাম ধাম, সে বিবাহিত কিনা ইত্যাদি। শ্বশুরালয়ে যেয়ে শ্বশুরের সাথে আলাপে তাই একান্ত স্বাভাবিকভাবেই সে জিজ্ঞেস করলো তার শ্বশুর বিবাহিত কিনা। গল্প দুটোই অবশ্যি বাংলা মৌখিক ঐতিহ্য ছাড়াও গিয়ার্সন সাহেবের[৪৭] ও ডক্টর শ্যামা শংকরের[৪৮] গ্রন্থদ্বয়ে আছে। ডক্টর শ্যামা শংকর আরেকজন জামাতার চিত্র দিয়েছেন যার পরিচয় এদেশেও অজ্ঞাত নয়। বন্ধু বান্ধব নববিবাহিত যুবককে শ্বশুরালয়ে যেয়ে কম কথা বলতে এবং কম কথা শুনতে উপদেশ দিয়েছে। যুবক ভাবলো মুখ এবং কানের ছিদ্রপথে তার ভেতরের জ্ঞান বুদ্ধি সব বেরিয়ে যেতে পারে সুতরাং সে কানে তুলো গুঁজে এবং মুখ বুঁজে শ্বশুরালয়ে পড়ে থাকলো (মটিফ-জে ১৯৭৭)। জনৈক নববিবাহিত পাঠান যাতে শ্যালক শ্যালিকার হাতে বিব্রত না হয় এজন্য সুহৃদবৃন্দ তাকে উপদেশ দিয়েছিল যেন খাবার জিনিষগুলো

---

৪৫। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন। লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে, (কলিকাতা, ১৯০৮), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১।

৪৫। পণ্ডিত শ্যামা-শংকর। উইট এণ্ড উইসডম, পৃঃ ৪১-৪৮।

৪৬। থোরবার্ণ। বান্নু, পৃঃ ২০৭-২০৮।

৪৭। লিঙ্গুইষ্টিক সারভে, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১।

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১-৪৮।

সে বিশেষভাবে দেখে খায় এবং ময়লা থাকলে ধুয়ে খায়। দুর্ভাগ্যক্রমে লবণের পাত্রে পাঠান একটি চুল দেখে পানি ঢেলে লবণ ধুয়ে বোকা বনে গিয়েছিল[৪৯] (মটিফ-জে ২১৭৩.৯)। এ জাতীয় আরেকজন জামাতার উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গের ছেদ টানা যেতে পারে। নববিবাহিত যুবককে সাধারণ পোষাকে প্রথম শ্বশুরালয়ে যাবার উপদেশ দেয়া হয়েছিল। যুবক ফকিরের বেশ ধরে শ্বশুরালয়ে প্রবেশপথে শাশুড়ীকে দেখে পালানোর চেষ্টা করে—পাশেই ছিল একটা বদ্ধ কূপ। সুতরাং সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আপাততঃ সে লজ্জার হাত থেকে বেঁচেছিল কিন্তু পরে সকলের হাতে পড়ে তার লজ্জার সীমা ছিল না[৫০] (টাইপ ১৩৩২ সি)। দক্ষিণ ভারতের লোক-গল্পের একজন জামাতা অথবা ছেলে উপদেশ শুনেছিল যে, যা সে আরম্ভ করবে তা যেন শক্ত করে ধরে থাকে। প্রথম শ্বশুরালয়ে গিয়ে ঘোড়া অথবা গাধা দেখে তার ঘোড়ায় উঠবার সখ হয়েছিল। সুতরাং ঘোড়ার লেজ ধরতে যেয়ে যখন ঘোড়া বারবার সরে যাচ্ছিল তখন সে শক্ত করে ঘোড়ার লেজ ধরে রেখেছিল এবং শেষ পর্যন্ত কয়েকটি লাথি খাবার পর ধূলোমলিন অথবা কর্দমাক্ত মাটিতে পড়ে অপমানিত হয়েছিল[৫১] (মটিফ-জে ২৪৮৯.৯)। অনুরূপ আরেকজন জামাতার কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। এ বেচারা শুধু বোকা নয়, অলসও বটে। প্রথম শ্বশুরালয়ে যাবার সময় ধীর মন্থর-গতিতে পথ চলতে চলতে পথেই তার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এ সময় রাস্তায় একটি বলদকে দেখে নবজামাতা ভাবলো এর লেজ ধরে ঝুলে পড়লে পথ চলবার পরিশ্রম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং দ্রুত গতিতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারা যাবে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বলদ তাকে কণ্টকাকীর্ণ ও কর্দমাক্ত এক ডোবার মধ্যে ছিটকে ফেলে চলে গেল[৫২] (টাইপ ১৬৮৫ এ, মটিফ জে ১৩৩২, ১৬৯১)।

---

৪৯। থোরবার্ন। বান্নু, পৃঃ ১৯৩।

৫০। স্যান্নার্টন ইণ্ডিয়ান নাইট্‌স, পৃঃ ৬৫-৭৮।

৫১। গণেশজী জেথাভাই। ইণ্ডিয়ান ফোকলোর (লিম্বি, ১৯০৩)। পৃঃ ১৫৭-৮৮।

৫২। এল, বাযবারুয়া। সাধু কথার কুকি (গৌহাটি, ১৯৪৮)। পৃঃ ১৬১।

৫২। স্যান্নার্টন। ইণ্ডিয়ান নাইট্‌স, পৃঃ ৬৫-৭৮।

॥ বিয়ের রাত্রে জামাতা ॥ বিয়ের রাত্রে নববিবাহিত যুবকের বোকামী নিয়ে গল্প প্রচলিত আছে। বিয়ের রাত্রে কর্তব্যকর্ম সম্পর্কিত সমস্যাই এই জাতীয় জামাতা বা স্বামীদের অধিক বিব্রত করে। মধ্যভারতের জনৈক যুবক কোনদিন নারী দেখেনি সুতরাং বিয়ের রাতে লম্বাকেশী স্ত্রীকে দেখে সে প্রেত মনে করে পলায়ন করে ( মটিফ জে ১৭৮৬.৬ )। বাংলা লোকগল্পেও এ জাতীয় কাহিনীর অভাব নেই। বিয়ের রাতে বাসর ঘরে ঢুকে বিছানায় মশারি টাঙ্গানো দেখে জনৈক যুবক কিভাবে মশারীর মধ্যে ঢুকতে হবে তা বুঝতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠে মশারীর চাঁদোয়ার ওপর লাফ দেয় এবং চাঁদোয়া সমেৎ তার ঘুমন্ত স্ত্রীর গায় পড়ে। স্ত্রী ভয়ে চীৎকার করে সকলের সাহায্য কামনা করে[৫৩] ( মটীফ জে ১৭৪৪৪.১.১ )। বিশ্ববিখ্যাত লোকলোরজ্ঞ এলউইন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Folk Tales of Mahakoshal ( London, 1944, P. 306 )-এ এই ধরণের এক জামাতার উল্লেখ করেছেন। বিয়ের রাত্রে কি করতে হবে তা সে কিছুতেই ঠাহর করতে পারে না ( মটীফ জে ১৭৪৪ ১ )। মধ্যভারতীয় লোকগল্পের জনৈক নায়ক আত্মীয় স্বজনের কাছে শুনেছিল যে বিয়ের রাতে সজাগ থাকতে হয়, কেননা চোর নববধূর গহনা পত্র চুরি করতে পারে। স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে সে ধীরে ধীরে উঠে বাসরঘরে রক্ষিত মাখনের পাত্রের ( অথবা মিষ্টান্ন পাত্রের ) সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়া দেখে ভাবে সত্যিসত্যি চোর এসেছে। সুতরাং সে লাঠির আঘাতে পাতিলটি ভাঙ্গে এবং চীৎকারে সবাইকে জমায়েৎ করে। ঘটনাস্থলে এসে ব্যাপারটি দেখেতো সবার আক্কেল গুড়ুম[৫৪] ( মটিফ জে ১৭৯১.৭ )। জনৈক বাঙ্গালী স্বামী স্ত্রীর সাথে চুপে চুপে বাসর ঘর ছেড়ে পাশেই একটি স্বচ্ছ পুকুরের ধারে এসে বসে। পূর্ণিমা চাঁদের ছায়া স্বচ্ছ পানিতে দেখে নব বিবাহিত স্বামী সোনার থালা মনে করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

একজন পাঞ্জাবী জামাতা বিয়ের রাতে ঢাক ঢোলকের বাজনা শুনে বিশেষভাবে কৌতূহলী হয়ে পড়ে। তার ধারণা ঢাকের মধ্যে নিশ্চয়ই একজন লোক থেকে এমন

৫৩। পণ্ডিত শ্যামা শংকর। উইট এণ্ড উইসডম্, পৃঃ ৫০।

৫৪। টেইলর। ফোকলোর, ৬ ( ১৮৯৫ ), ৪০৬।

শব্দ করে। সুতরাং অবকাশ বুঝে সে ঢাকের কাছে যেয়ে ঢাকের মধ্য থেকে লোক বের করবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে আরম্ভ করে। গোলমাল শুনে সকলেই সেখানে ছুটে আসে। কাণ্ড দেখে তো সবাই অবাক[৫৫]। জনৈক বেলুচ বিবাহের রাতে স্ত্রীকে ভবিষ্যতে সুখী করবার জন্য মনে মনে আকাশে প্রাসাদ গড়বার কল্পনা করে। ভোরে উঠে শ্বশুরালয়ের পোষা বাজ পাখীটিকে সে খাঁচা থেকে বের করে চুপে চুপে আকাশে ছেড়ে দেয়—ছেড়ে দেবার পূর্বে পাখীটিকে মিনতি জানায় সে উড়ে গিয়ে আকাশে যেন তার জন্য একটি প্রাসাদ রচনা করে। গল্পটির একটি পাঠ এল এম ডেন্স সাহেব সংগ্রহ করেন।[৫৬] (মটিফ-জে ২০২৬)।

॥ রাতকানা জামাতা ॥ রাতকানা জামাতা আমাদের অনেক লোকগল্পের রসদ জুগিয়েছে। বলাবাহুল্য জামাইদের বোকামীই এসব গল্পের মূল বিষয়। প্রবন্ধের কলেবরের দিকে লক্ষ্য রেখে এ জাতীয় দুটো গল্পের অধিক এখানে উল্লেখ করা উচিত হবে না। এদের একজন নায়ক শ্বশুরালয়ে রাত্রিতে খেতে বসে বিড়াল বিবেচনায় পরিবেশনরত শাশুড়ির হাতে প্রচণ্ড আঘাত করে (টাইপ ১৬৮৫ বি)। অপরজন শ্বশুরালয়ে রাত্রিযাপনের সময় ঘুমন্ত শাশুড়ীর বিছানায় হানা দেয়। শেষোক্তজন অবশ্যি অপেক্ষাকৃত চতুর কেননা শাশুড়ির হাতে ধরা পড়ে সে বলে প্রাক্তন অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই তার এ আগমনের উদ্দেশ্য (টাইপ ১৬৮৫ সি)।

॥ দুর্দান্ত বোকা জামাতা ॥ জামাতাদের দুর্দান্ত বোকামীর চিত্রও লোকগল্পে প্রচলিত রয়েছে। পাঠান ও মাদ্রাজীদের মধ্যে প্রচলিত একটি গল্পের নায়ক বিয়ের রাতে অপূর্বা সুন্দরী স্ত্রীর চোখ দুটো তুলে ফেলেছিল কেননা সে শুনেছিল যে সুন্দরী স্ত্রী মাত্রেই স্বামীর শত্রু[৫৭] (মটিফ জে ২৪৭২.৩)। একটি আসামী গল্পের জামাতা মাথায় বোঝা নিয়ে শাশুড়ির বাড়ীতে পৌঁছলো। বৃদ্ধা শাশুড়ির মেজাজ সেদিন ভাল

---

৫৫। রামশামী রাজু। ইণ্ডিয়ান ফেব্‌ল্‌স (লণ্ডন, ১৮৮৭)। পৃঃ ৩৭।

৫৬। ফোকলোর, ৩ (১৮৯২), ৫২৭।

৫৭। থোরবার্ণ। বান্নু, পৃঃ ২০৭।

৫৭। পণ্ডিত নাটেসা শাস্ত্রী। ইণ্ডিয়ান ফোকটেলস (মাদ্রাজ, ১৯০৮), পৃঃ ৪৪৮।

ছিল না। বোঝা কোথায় রাখবে একথা জিজ্ঞেস করতে শাশুড়ি বিরক্ত হয়ে বললো "আমার মাথায় রাখ"। যে কথা সেই কাজ। জামাতা বোঝাটি বৃদ্ধা শাশুড়ির মাথায় ফেলে দিল। ফলে শাশুড়ির মৃত্যু ঘটলো[৩৮] (মটিফ জে ২৪৬১ ৭)। গল্পটি অবশ্যি বাংলা দেশেও প্রচলিত আছে, কিন্তু বাংলা গল্পের নায়ক জামাতা নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকর। বাংলায় গল্পটি "ঘুঘু দেখেছ কিন্তু ফাঁদ দেখনি" নামে পরিচিত, অর্থাৎ আরণে-থম্পসনটাইপ ১০০০ এর অন্তর্গত। লেপচাদের মধ্যে প্রচলিত একটি লোক-গল্পের জামাতা অবশ্যি বোকামীতে ও বীভৎসতায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। বৃদ্ধা শাশুড়ির (কোন কোন গল্পে মাতার) মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাবার পথে জামাতা-টির পায়খানা চাপে। মৃতদেহটি রাস্তায় নামিয়ে সে কর্তব্যকর্ম করতে যায়। ফিরে এসে দেখে মৃতদেহটি নেই। কিন্তু একটি বৃদ্ধা তখন রাস্তা দিয়ে আসছিল। সে ভাবলো এটিই বোধহয় তার শাশুড়ি। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে বৃদ্ধাকে হত্যা করে লাশ নিয়ে শ্মশানে চলে গেল[৩৯] (মটিফ জে ১৯৫৯.২)। একটি সাঁওতালী এবং পশ্চিম ভারতীয় গল্পের জামাতা শ্বশুরালয়ে একটি গরুকে (অথবা ছাগল) জাবর কাটতে দেখে ভাবলো গরুটি নিশ্চয়ই তাকে গাল দিচ্ছে। অতএব প্রচণ্ড আঘাতে সে গরুটিকে ধরাশায়ী করলো[৪০] (মটিফ জে ১৮৩১)।

॥ বোকা স্বামী ॥ বোকা জামাতাদের আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকজন বোকা স্বামীর কাহিনীও লিপিবদ্ধ না করলে প্রবন্ধের সামগ্রিক আলোচনা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে না বলে প্রবন্ধ লেখকের ধারণা। কেননা জামাতারা শ্বশুরালয়ে জামাতা কিন্তু স্বগৃহে স্বামী। শ্বশুরালয়ে যারা বোকামীর পরিচয় দেয় স্বগৃহে তারা যে স্ত্রীর সঙ্গে চলনবলনে খুব চতুর এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। বরঞ্চ স্বগৃহেও তাদের বোকামীর পরিচয় কম হাস্যাস্পদ নয়। অবশ্যি স্বামী বলতে এদেশের সমস্ত বিবাহিত

---

৩৮ [illegible] এ কালেকশন অব কাচারী ফোকটেলস। পৃঃ ৪৪।

৩৯ [illegible] "[illegible] এণ্ড কাষ্টমস অব দি ল্যাপচাজ অব সিকিম", [illegible] বেঙ্গল, ২১ (এন, এস, ১৯২৫), ৩২৭, ৫০৫।

৪০ [illegible], পৃঃ [illegible]। বোডিং, সাওতাল ফোকটেলস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭১।

৪১ [illegible] ([illegible], ১৮৯১) পৃঃ ৭।

লোকের কথাই ধরতে হয়। কিন্তু এখানে শুধুমাত্র কয়েকজন বোকা স্বামীর উল্লেখ থাকবে যারা স্ত্রীর সাথে দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বোকামীর পরিচয় দিয়েছে। এদের একজনকে প্রবন্ধ পাঠকদের সহজেই এবং সর্বাগ্রেই চিনে ফেলবার কথা। বেচারা বাঙ্গালী কিনা। ঝগড়াটে স্ত্রীর ওপর রাগ করে স্ত্রীকে বিধবা করবার উদ্দেশ্যে সে অনায়াসেই আত্মহত্যা করে (মটিফ জে ২১০৬)। গল্পটি অবশ্যি বোম্বে অঞ্চলেও প্রচলিত আছে[৬১]। আরো একজন অনুরূপ জামাতা এ দেশের জলবায়ুতেই বর্ধিত। স্ত্রী বিধবা হয়েছে এ খবর পেয়ে সে অতিসত্বর বাজার থেকে বিধবার কাপড় কিনে বাড়ী ফিরলো। স্ত্রী বেচারী কাপড় পেয়ে খুশীই হলো এবং কাপড়টি পরলোও। এতে স্ত্রীর বৈধব্য সম্পর্কিত খবর, স্বামীর মনে সত্য হিসেবেই স্থায়িত্ব লাভ করলো[৬২]। (মটিফ জে ১৩০১.২)। বাংলার আরেকজন স্বামী হাতী দেখে এসে স্ত্রীর কাছে বর্ণনা দিচ্ছে। বর্ণনা দিতে গিয়ে সে বিস্মিত হয়ে গেল এই ভেবে যে হাতীর দুদিকেই লেজ। তাহলে হাতী আহার করে কি করে। অতএব সে এই সিদ্ধান্তে এলো যে হাতী হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকে[৬৩] (মটিফ জে ১৯০৩.৪)। এই জাতীয় আরেকজন স্বামীর কথা উল্লেখ করে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যেতে পারে। বাড়ীতে চামচিকের অথবা ছারপোকার অত্যাচারে স্ত্রী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। স্বামীকে সে বারবার বলেছে এ অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার একটি উপায় উদ্ভাবন করতে। কিন্তু স্বামী কোন উপায়ই খুঁজে পায়নি। একদিন স্ত্রী যখন অন্যত্র অথবা পিত্রালয়ে চলে গেছে তখন বাড়ীতে সে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। প্রতিবেশীরা আগুন নিভাতে এলে সে তার অভিনব উপায়ের কথা সরবে ঘোষণা করেছে। (মটিফ জে ২১০৩.৩)। কাহিনীটি পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন পাঠান্তর-সহ সুপরিচিত। জনৈক ধার্মিক স্বামীর ওপর দুগ্ধ গরম করবার ভার দিয়ে স্ত্রী পাশেই অন্য কার্যে লিপ্ত হয়। দুধ যখন উথলিয়ে পড়বার উপক্রম হয়, স্বামী তখন দোয়াদরুদ পড়তে থাকে। স্ত্রী অবশ্যি

---

৬১। গণেশজী জেথাভাই। ইণ্ডিয়ান ফোকলোর, পৃঃ ১০।

৬২। পণ্ডিত শ্যামা শংকর। উইট এণ্ড উইসডম, পৃঃ ৩৯।

৬৩। ইবিড, পৃঃ ৭।

স্বামীর অগোচরেই পাতিলে একটু ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দেয় এবং এতে ক্ষিপ্ত দুগ্ধ শান্ত হয়। স্বামী মনে করে তার মোনাজাতেই দুগ্ধ শান্ত হয়েছে।[৬৪]

॥ দুশ্চরিত্রা স্ত্রী ও বোকা স্বামী ॥ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বোকা স্বামী এ প্রসঙ্গে পাকভারতীয় লোকগল্পে অসংখ্য গল্প প্রচলিত রয়েছে। এ গল্পগুলোর অধিকাংশেরই উৎস হোল পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, স্মৃতিকথা সংগ্রহ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ। অবশ্যি আলোচ্য গ্রন্থগুলোর আবার উৎস ছিল মূলতঃ তৎকালীন লোকলোর। একথা সত্য যে পাকভারতীয় লোকলোরের বিশেষ করে লোকগল্পের বিষয়বস্তু যুগে যুগে স্থান বদলিয়েছে। মৌখিক থেকে লিখিত এবং লিখিত থেকে মৌখিক পর্যায়ে যুগে যুগে বিষয়বস্তুর স্থান পরিবর্তন ঘটেছে। এজন্য পাকভারতীয় লোকলোরের, বিশেষ করে কোন অংশ যে মৌখিক এবং কোন অংশ যে লিখিত এ সিদ্ধান্তে আসা সহজ কথা নয়।

যাহোক, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বোকা স্বামী এ প্রসঙ্গে আলোচনা স্পষ্ট করবার জন্যে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। জনৈকা স্ত্রীর প্রেমোন্মত্ত উপপতি ওষ্ঠাধরে চুম্বন করতে যেয়ে নাকে কামড় দিয়ে বসে। প্রাতে স্বামী এই জখম সম্পর্কে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে স্ত্রী বলে রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ তার স্বামী নিজেই এভাবে কামড়ে দিয়েছে। স্বামী নির্বাচারে এ যুক্তি বিশ্বাস করে নিল (টাইপ ১৪১৭)। অপর একজন স্ত্রী উপপতি নিয়ে রাত্রিযাপন করছিল। এমন সময় স্বামী বাড়ীতে প্রবেশ করে। স্ত্রী সাথে সাথে অসুখের ভান করে এবং শীঘ্র স্বামীকে ডাক্তার ডাকতে বলে। স্বামী ডাক্তার ডাকতে গেলে সেই ফাঁকে উপপতি পলায়ন করে[৬৫] (টাইপ ১৪১৯)। মীর্জাপুর অঞ্চলের একটি লোক-গল্পের নায়িকা উপপতির সাথে প্রেম লীলায় মগ্ন ছিল। এমন সময় তার স্বামী গৃহে প্রবেশ করে। উপপতির অশ্বটি বাঁধা ছিল বাড়ীর প্রাঙ্গণে। স্বামী লোকটিকে দেখবার সুযোগ পায়নি কেননা স্ত্রী পূর্বেই তাকে নিরাপদ

---

৬৪। শ্যামাশংকর। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭।

৬৫। নর্থ ইণ্ডিয়ান নোট্‌স্ এণ্ড কোয়েরীজ, ৪ (১৮৯৪) ৫৬।

স্থানে আড়াল করে ফেলে। কিন্তু ঘোড়া দেখে স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে স্ত্রী সহাস্যে জবাব দেয় তাদের গাভীটি গতরাত্রে ঐ অশ্ব প্রসব করেছে। স্বামী এ যুক্তি সত্য বলেই মেনে নেয়[৬৬] (মটিফ কে ১৫৪৯.৪)। জনৈকা মাদ্রাজী দুশ্চরিত্রা স্ত্রী কর্ম ফেরৎ স্বামীকে জিজ্ঞেস করে সে যদি অন্ধ হোত তবে তার অভিজ্ঞতা কি হোত। এ কথা শুনে স্বামী সঙ্গে সঙ্গে দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে অন্ধত্বের অসুবিধে অনুভব করে। ইত্যবসরে স্ত্রী তার উপপতিকে দরজা দিয়ে বাইরে বের করে দেয়[৬৭] (মটিফ কে ১৫১৬.৬)। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরী অঞ্চলের জনৈকা স্ত্রী গাভী-দোহনরত স্বামীকে চক্ষু বন্ধ করে দোহন করতে সে সমর্থ কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে বলে। স্বামী অন্ধভাবে এই পরীক্ষা অনুসরণের সময় স্ত্রী তার অনুগত উপপতির চুম্বন ও আলিঙ্গন গ্রহণ করে।[৬৮] এ জাতীয় স্বামী বা দুশ্চরিত্রা স্বামীর উদাহরণ পাক-ভারতীয় লোকগল্পে অসংখ্য। বলাই বাহুল্য যে এ জাতীয় গল্পের মূল উৎস পঞ্চতন্ত্র এবং বৌদ্ধজাতক।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মিলিত বোকামীর নিদর্শনও পাকভারতীয় লোকগল্পে প্রচুর মিলবে। বিশেষ করে নির্বাক প্রতিযোগিতা (Silence wager) শ্রেণীর মটিফ গুলোতে এই জাতীয় গল্প দেখতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ এখানে কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনটি মাত্র মাছ (কৈ অথবা পুঁটি), স্বামী স্ত্রীতে খাবার সময় ঝগড়া, কে দুটো খাবে এবং কে একটি খাবে। শেষ পর্যন্ত স্থির হোল, যে আগে কথা বলবে সে খাবে একটি। দুজনের মধ্যে নির্বাক থাকবার প্রতিযোগিতা শুরু হোল। সারারাত গেল, সকালও পার হয়ে গেল। দুপুরের দিকে প্রতিবেশীরা এসে দেখলো এরা নির্বাক। শুধু নির্বাক নয়, প্রতিবেশীরা ধরে নিল এরা মৃতও। সুতরাং সৎকারের জন্য প্রতিবেশীরা দুজনকে শ্মশানে নিয়ে গেল। তিনজন লোকের ওপর সৎকারের ভার দিয়ে অন্যান্য প্রতিবেশীরা ফিরে এল। এদিকে দুজনকে চিতায় তুলে যখন আগুন ধরিয়ে দেয়া হোল তখন এরা আগুনের উত্তাপে আর থাকতে

---

৬৬। ইবিড, নং ৫৫।

৬৭। ভেনকটাস্বামী। ফোকটেলস ফ্রম ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৭২।

৬৮। মারে, বি, এমিনিউ। কোটা টেক্সট।

পারলো না। স্ত্রী চিতা থেকে লাফিয়ে উঠে বললো "আমি একটিই খাবো"। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী লাফিয়ে উঠে বললো "আমি দুটো খাব"। প্রতিবেশীরা ছিল তিনজন। তারা ভাবলো, নিশ্চয়ই এরা মরে গিয়ে প্রেত হয়েছে এবং প্রেতদ্বয় সংখ্যা উল্লেখ করে তাদেরকে খাবার কথা বলছে। সুতরাং তারা দৌড়লো বাড়ীর দিকে। এদের পেছনে স্বামী স্ত্রীও "আমি দুটো খাব" ও "আমি একটি খাব" বলতে বলতে ছুটলো। প্রতিবেশীত্রয় ওদেরকে পেছনে আসতে দেখে প্রাণপণ চীৎকারে ছুটলো[৬৯] (মটিফ জে ২৫১১.১)। কোন কোন কাহিনীতে স্বামী স্ত্রীর নির্বাক প্রতিযোগিতা হয় কে দরজা বন্ধ করবে, অথবা তিনটি পিঠার কে দুটো খাবে এই সমস্যা নিয়ে; আবার কোন কোন কাহিনীতে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হবার মান নির্ণীত হয় যে আগে কথা বলবে এই প্রতিজ্ঞার ওপর নয়, বরঞ্চ যে ঘুম থেকে আগে জাগবে এই প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে। শেষোক্ত কাহিনীতে স্বামী স্ত্রী ঘুম থেকে জাগলেও ঘুমের ভান করতে থাকে যার ফলে প্রতিবেশীরা ধরে নেয় তারা মৃত। বলাবাহুল্য, এ জাতীয় গল্পগুলো বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত। ডক্টর শ্যামা শংকর গঙ্গা উপত্যকার কাহিনীর মধ্যে বাঙ্গলা দেশের একটি লোকগল্পের চিত্র তুলে ধরেছেন। এ গল্পে নির্বাক প্রতিযোগী স্বামী স্ত্রী মৃত হিসেবে রাজ দরবারে আনীত হয়। রাজা তাদের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সঠিক সংবাদদাতাকে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলে স্ত্রী লাফিয়ে ওঠে এবং পুরস্কার দাবী করে[৭০] (মটিফ জে ২৫১১.১.২)।

এ পর্যন্ত যে জাতীয় লোকগল্পগুলোকে নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করে বিভিন্ন শ্রেণীর বোকা জামাতা ও বোকা স্বামীদের পরিচয় এ প্রবন্ধে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে, বলাই বাহুল্য যে এই জাতীয় লোকগল্প পাকভারত উপমহাদেশের সর্বত্রই সুপরিচিত। প্রবন্ধটি যদি শুধুই বাংলা লোকগল্পগুলোকে কেন্দ্র করে লিখিত হোত,

---

৬৮। উইলিয়ম ম্যাককুলক। বেঙ্গল হাউজহোল্ড টেল্স। পৃঃ ১২৫।

৬৯। জর্জিন হাওয়ার্ড কিংস্কট এবং নাটেসা শাস্ত্রী। টেল্স অব দি সান (লণ্ডন, ১৮৯০)। পৃঃ ২৮৩।

৭০। শ্যামাশংকর। উইট এণ্ড উইসডম, পৃঃ ৫৮।

নিশ্চয়ই প্রবন্ধ লেখকও এতে আনন্দ অনুভব করতে পারতো। কিন্তু প্রবন্ধ লেখকের প্রাক্তন উক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে তুলনামূলক আলোচনা বিশেষ আলোচনার চেয়ে অধিক কাম্য। পাকভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে বর্তমানে যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষিত হয় প্রাচীনকালে এমনটি ছিল না। লোকলোর প্রাচীনতার বাহক। লোকলোরেরই শাখা হিসেবে লোক-সাহিত্য এই প্রাচীনতাকে ধারণ করে আজও গ্রাম মাঠ শহর বন্দরে বিরাজমান। এ জন্যেই পাকভারত উপমহাদেশে আঞ্চলিক লোকসাহিত্যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সান্নিধ্য এতো নিবিড়। এই সান্নিধ্য আবিষ্কার নিশ্চয়ই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়—তবু বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগল্পের মধ্যে বোকা জামাতার কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুগতসাদৃশ্য এ প্রবন্ধের অপর বিশেষ লক্ষ্য।

অবশ্যি একথা অস্বীকার করা চলে না যে বাংলা লোকগল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এর সংগ্রহ ও প্রকাশনার ক্ষেত্র খুব প্রসারিত নয়। ফলে শুধু বাংলা লোকগল্প-গুলোকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় প্রবন্ধ লেখা সহজসাধ্য একথা বলবার ধৃষ্টতা প্রবন্ধ-লেখকের নেই। শুধু সংগ্রহ নয়, সংগৃহীত কাহিনীগুলোর বিষয়বস্তুভিত্তিক স্তর-বিভাগ এবং তার বৈজ্ঞানিক আলোচনা বাংলা লোকলোরের ক্ষেত্রে হয়নি বললেই চলে। আজ এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী অনুভূত হচ্ছে, কেননা ইউরোপ আমেরিকার কথা ছেড়েই দিলাম, এশিয়ারও কয়েকটি দেশে এ ধরণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। একথা ধ্রুব সত্য যে এ পর্যন্ত যে জাতীয় লোকগল্পের আলোচনা এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হয়েছে, এ জাতীয় গল্প পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধলেখক বিশ্বাস করে শুধু একটি অঞ্চল অথবা স্থানবিশেষে, মাত্র একটি গ্রাম থেকে যদি এমন বোকা জামাতা বা স্বামীদের কাহিনী সংগ্রহ করা যায় তবে বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত চরিত্রগুলোর প্রায় সবারই সাক্ষাৎ মিলবে অথবা সংখ্যাধিক্যে এ প্রবন্ধে উল্লিখিত চরিত্রগুলোর সংখ্যাকে হার মানাবে। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে মাঠে কর্মরত এক একজন মানুষ লোকলোরের এক একটি ভাণ্ডার। তাদের মধ্যে থেকে যতবেশী লোকলোরের উপকরণ সংগৃহীত হবে, পূর্ব পাকিস্তানের লোকসাহিত্য পাঠ ও অধ্যয়নের ক্ষেত্র তত বেশী সমৃদ্ধ এবং প্রসারিত হবে।

## প্রবন্ধে উল্লিখিত বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থ ও পত্রিকার তালিকা:—


Anderson, James Drummond. A Collection of Kachari Folk-Tales and Rhymes. Shillong, Assam Secretariate Printing Office, 1896. pp. 61.

Banerjee, Kasindranath. Popular Tales of Bengal, Calcutta, 1905.

Bezbarua, L. Sadhu Kathar Kuri. Gauhati, 1948.

Bodding, Paul Olaf. Santal Folk-Tales. 3 Vol. Oslo and Cambridge, Mess. 1925-29. Vol. I : pp. Xvi+369 ; Vol. II : pp. vi+403 ; Vol. III : pp. 411.

Bodker, L. Indian Animal Tales : A Preliminary Survey, FFC 170, Helsinki, 1957.

Bompas, Cecil Henry. Folklore of the Santal Parganas. London, David Nutt, 1909. pp, 483.

Bradley-Birt, Francis Bradley. Bengal Fairy Tales. London, John Lane Co., 1909, pp. 209.

Brown, William Norman. "The Silence Wager" American Journal of Philology, XLII ( 1922 ), 289-317.

Campbell, A. Santal Folk-Tales. Pakhuria ( Manbhum ), The Santal Mission Press, 1891, pp. 127.

দাস, এস, সি। মোর দেশের সাধুকথা। জোড়হাট, ১৯৩৯।

Day, Lal Behari. Folk-Tales of Bengal. London, Macmillan and Co. Ltd., 1912 ( firsrt ed. 1883 ), pp. 274.

Devi, Shovona. The Oriental Pearls. London, Macmillan and Co. Ltd., 1915. pp 177.

Dorson, Richard M. ed. Folklore Research Around The World, Indiana University Press, Bloomington, 1961. pp. 197.

Elwin, Harry Varrier Holman. Folk-Tales of Mahakoshal. London Oxford University Press, 1944. pp. XXV+523.

Emeneau, Murray B. Kota Texts 4 parts, Berkeley and Los Angeles 1944-46.

Grierson, George Abraham. Linguistic Survey of India. Vol. 3,5, & 6. Calcutta, Government of India, Central Publication Branch, 1890.

——— Bihar Peasant Life, Patna Supdt. Govt. Printing. ( Revised in 1926, pp. 433+155 ). 7 D 7

Islam, M. A History of English Folktale Collections in India and Pakistan. Indiana. U. S. A., 1963, pp. 264. ( unpublished Ph. D. thesis )

ইসলাম, মযহারুল। কবি হেয়াত মামুদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৬১। পৃ: ৮১৬।

Jethabhai, Ganeshji. Indian Folkore. Limbi, 1903.

Journal of the Anthropological Society of Bombay. Calcutta, 1886-1936.

King, L. V. "The Tales of the Punjab." Folklore, London, XXXVI (1925).

Kingscote, Georgina Howard and Natesa Sastri. Tales of the Sun. London, W. H. Allen and Co., 1890. pp, Xii+308,

Knowles, Rev. James Hinton. Folk-Tales of Kashmir. London, Kegan Paul, Trubner and Co. Ltd., 1888. pp 510.

Mcculloch, William. Bengali Household Tales. London, Horder and Stoughton, 1912, pp. 320.

Minaevim, I. P. Indejskia Skazki Legendi. St. Petersburgh, 1876.

Oconnor, W. F. Folktales from Tibet, London, 1906.

Parker, Henry. Village Folk-Tales of Cyelon. 3 vols. London, Luzac and Co., 1910-1914, Vol. I : pp. 396 ; Vol. II : pp. 466, Vol. III : pp. 479.

Rivers, W. H. The Todas. London, 1906, pp, xviii+755.

Steel, Flora Annie and Richard Carnac Temple. Wide-Awake Stories. Bombay, Educational Society Press, 1884. pp. 445.

Stocks, C. de Beauvoir. "Folk-Lore and Customs of the Lap-chas of Sikhim" Journal and Proceedings of Asiatic Society of Bengal ( N. S. ) XXI, 341-43.

Stokes, Maive. Indian Fairy Tales. Calcutta, Privately Printed, 1879, pp. 303.

Swynnerton, Charles. The Adventures of the Punjab Hero Raja Rasalu, Calcutta, W, Newman and Co, Ltd., 1884. pp. 250.

——— Indian Nights Entertainment or Folk Tales from the Upper India. London, Oxford University Press, 1928, pp. XV+353.

Tawney, C. H. Katha Sarit Sagara, or Ocean of the streams of Stories, 2 Vols. Calcutta, 1880-1884.

Thompson, Stith and Jonas Balys. The Oral Tales of India, Bloomington, Indiana University Press, 1958, pp 448.

Thompson, Stith and Warren E. Roberts. Types of Indic Oral Tales, India Pakistan and Ceylon. F. F. Communications No. 180. Helsinki, Snomalainen Tiedeakatemis Academia Scientiarum Fennica.

Thorburn, Septmus Smith. Bannu or Our Afgan Frontier. London Trubner, 1876. pp. 480.

Touscher, Rudolf. Volksmarchen Aus Dem Jeyporeland. Berlin, Welter De Gruyter and Co., 1959. pp. 196.

Twente, Theo H. Folktales of Chhattisgarh, North Tanawanda, New York, 1938.

Upreti, Pandit Gang Datta. Proverbs and Folklore of Kumaun and Garhwal. Lodiana, 1894.

Venkataswmi, M. N. Folktales from India. Madras 1923.

—

# দোভাষী পুঁথির কবি সৈয়দ হাম্‌যা

(১৭৩৩-১৮০৭)

ডক্টর গোলাম সাক্‌লায়েন

## ॥ কবি-পরিচিতি ॥

হাওড়া-হুগলী জেলার বালিয়া হাফিযপুরের কবি ফকীর (অথবা শাহ্‌) গরীবুল্লাহ্‌ দোভাষী বাংলায় (অথবা মুসলমানী বাংলায়) কাব্য রচনার পথিকৃৎ। তৎপ্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করতে গেলে তৎক্ষণাৎ আর যাঁর নাম আমাদের স্মরণ পথে পতিত হয়, তিনি হলেন কবি সৈয়দ হামযা। সৈয়দ হামযা গরীবুল্লাহ্‌ প্রবর্তিত ভাষা-রীতি অবলম্বনেই তিনখানি কাব্য লিখে গেছেন. তাঁর 'মধুমালতী' একমাত্র ব্যতিক্রম। 'মধুমালতী' কবির তরুণ বয়সের লেখা কাব্য। এই সময়ে সৈয়দ হামযা, ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র প্রবর্তিত ভাষা-রীতি আয়ত্ত করতে পারেন নি ব'লে মনে হয়। এ-কারণে তিনি তাঁর প্রথম কাব্য 'মধুমালতী' রচনা করেছিলেন মুঘল আমলের ঐতিহ্য-বাহী সাধু বাংলা ভাষায়। অতঃপর, হামযা বাকি তিনখানি কাব্য লেখেন দোভাষী বাংলায় তাঁর ওস্তাদ গরীবুল্লাহ্‌র অনুসরণে। সৈয়দ হামযার পরবর্তী বহু কবিই এই দোভাষী বাংলা রীতি অবলম্বন করেছিলেন কাব্য রচনার জন্যে; কিন্তু ভাষা ও কবিত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে সৈয়দ হামযার সঙ্গে তাঁদের কোন তুলনাই চলে না। তুলনা চলে শুধু তাঁর ওস্তাদ ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র সঙ্গে। সৈয়দ হামযা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন: 'দক্ষিণ রাঢ়ের মুসলমান কবিদের মধ্যে রচনা বাহুল্যে সৈয়দ হামযাই শ্রেষ্ঠ।'[১]

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: ১ম খণ্ড কলিকাতা, ২য় সংস্করণ ১৯৪৮; পৃঃ ৯২২।

সৈয়দ হামযা তাঁর 'আমীর হামযা' ( ২য় বালাম ) কাব্যের সূচনায় তাঁর পূর্বসূরী ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র সম্পর্কে প্রশংসাসূচক উক্তি করেছেন।[২] কবির নিজের ঠিকানা, ব্যক্তিগত জীবন-কথা ও পিতা-পিতামহ সম্পর্কে যাবতীয় খবরাখবর পরিষ্কার ভাবেই কাব্যে উল্লেখ করেছেন। আর তার চেয়েও বড় কথা সৈয়দ হামযা নিজের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধেও অস্পষ্টতা কিছু রাখেন নি। কবি-বর্ণিত আত্মপরিচয় মারফত তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারা যায়। তৎরচিত চারখানি কাব্যে তাঁর পরিচয়-জ্ঞাপক বিক্ষিপ্ত অংশগুলিতে তিনি বলেছেন ঃ

ক সৈয়দ হামযা বলে মুরসিদ ভাবনা।
ওহ্না বসতি যার ভুরশুট পরগণা ॥

* * *

আমার বাপের নাম হেদাতুল্লা মীর।
তাহার বাপের নাম আবদুল কাদির ॥
বিধাতা দিয়াছে দুই পুত্র মোর ঘরে।
কলিমদ্দি কুতবদ্দি জগতে প্রচারে ॥
তাহা সবারে কুশলে রাখেন করতার।
দুই পুত্রে লক্ষ্মীলাভ শ্রমাই অপার ॥
মেহেদি মোল্লার হউক দুকুল উজালা।
কভু যেন কুলে তার নাহি পরে মলা ॥
সাকিন বসন্তপুরে যাহার বসতি।
যার বাড়ি আঠার বৎসর মোর স্থিতি ॥
তস্য জ্যেষ্ঠ পুত্র সেখ খুবী মোহাম্মদ।
তাহার গুণের আমি কি কহিব হদ ॥

২ আলোচ্য প্রবন্ধে 'কবির কাব্যগুরু' শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।

গুণবান পঞ্চভাই মহিমা অপার।
একে একে বিবরিয়া কহিব সবার॥
করতার সবাকার কল্যাণ কুশলে।
পরিবার সমেত রাখেন কালে কালে॥
তস্য জ্যেষ্ঠ পুত্র সেখ গোলাম ইদরিস।
বড়ই ভক্ত মোর গুণবান শিষ॥
জন্মিল ঈদের দিনে ভুবন মণ্ডলে।
তেকারণে নাম তার ইদু ইদু বলে॥
তাহার নিমিত্তে কৈনু কবিতা প্রচার।
নতুবা পুঁথির চেষ্টা না ছিল আমার॥

(মধুমালতী)

খ. ভুরশুট পরগণা বিচে উদুনা বাগের নিচে
বসবাস কদিমি মোকাম।
আবদুল কাদের দাদা যার বড়া দেল সাদা
বাপ মেরা হেদাতুল্লা নাম॥
কলিমদ্দি বড়া বেটা কুতুবদ্দি তার ছোটা
এই দুই মাছুম আমার।

(জৈগুনের পুঁথি)

গ. হানিফার পাঙ্‌তলে সৈয়দ হামযা বলে
ভুরশুট পরগণা যার ঘর।
উদনায় বসতি ছিল বানেতে খারাব হৈল
তিন হাত বাড়িল উপর॥

(জৈগুনের পুঁথি)

ঘ. রসুলের পাঙ্‌তলে সৈয়দ হামযা বলে
ঘর যার ভুরশুট উদানা।

সন নিরানই সালে আমার কপাল ফলে
বাড়িতে পড়িল তিন হানা ॥
চাষবাস যত ছিল বাড়ি ঘর সব গেল
ভরা ডুবি হৈল মাঝ মাঠে।
দেলেতে আফসোস বড়া হইয়া যে গাঙ্ ছাড়া
পরগণা বায়েড়া রাণাঘাটে।

( জৈগুনের পুঁথি )

৬. মুরসিদের পাঙ্তলে সৈয়দ হামযা বলে
ঘর যার উদানা মোকাম।
আছিল সৈয়দ জাদা আবদুল কাদের দাদা
বাপ মীর হেদাতুল্লা নাম ॥

* * *

আছে এক খরিদার এই কবিতার হার
তার গলে পরাইত লিয়া।
যে মোরে কারার দিল পুঁথিখানি লিখাইল
কালি কলম আর সাদা দিয়া ॥
কবিতার বাত কহি দেলেতে বুঝিতে ছহি
যতেক রসিক বন্ধুগণ।
আছিনু বসন্তপুরে মঙ্গনদ্দি মোল্লার ডেরে
সেইখানে করিনু যতন ॥

( হাতেম তাঈ )

উপরোক্ত উদ্ধৃতির রেখাঙ্কিত অংশগুলি মারফত স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, কবি সৈয়দ হামযার পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্ত্তমান হুগলী-হাওড়া জেলার সিমান্তে অবস্থিত

ভুরশুট পরগণায়।[৩] তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহ ও পিতামহের নাম সৈয়দ আবদুল কাদির। কবির দুই পুত্র ছিল কলিমুদ্দীন এবং কুতুবদ্দীন। কবি বংশীয় ঘরের সন্তান। সুবিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত J. F. Blumhardt কবি-রচিত তিনখানি কাব্যের পাণ্ডুলিপিগুলি পরীক্ষা করে তৎসম্পর্কে উপরোক্ত উক্তির পোষকতা করেছেন।[৪] উপরোক্ত কাব্যাংশগুলি মারফত আরও জানা যায় যে, কবি প্রথমে বাস করেছিলেন পৈত্রিক বাসভূমি ভুরশুট উদনাতে; কিন্তু ১১৯৯ সাল অর্থাৎ ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে দামোদরের 'হানা'য় (বন্যা) বাড়িঘর ক্ষেতখামার নষ্ট হয়ে গেলে তিনি বায়েড়া পরগণার রাণাঘাট নামক স্থানে গমন করেন। যাহোক, সৈয়দ হামযা তিন তিনটি স্থানে বসবাস ও কাব্যচর্চা ক'রেছিলেন। প্রথমে পৈত্রিক বসতভূমি উদানায় (অছুনা) তারপর বসন্তপুর ও বায়েড়া পরগণার 'রাণাঘাট' নামক স্থানে। অবশ্য বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সাংসারিক অভাব-অনটনের হাত এড়াবার জন্য এবং নিশ্চিন্ত মনে কাব্য-সাধনায় আত্মনিয়োগের অভিলাষে কবি পৈত্রিক বসতভূমি ত্যাগ করে স্থানান্তরে গমন করেন। কবির কাব্য-সাধনা পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় বসন্তপুরের বিদ্যোৎসাহী মেহেদী মোল্লা বা মঈনুদ্দীন মোল্লার বাড়ীতে এবং বায়েড়া পরগণার 'রাণাঘাটে'।

---

৩ পশ্চিমবঙ্গে ইসলামী সাহিত্যের পীঠস্থান পাণ্ডুয়া ছিল দুটি। একটি ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া এবং অপরটি হাওড়া-হুগলীর সীমান্তবর্তী ভুরশুট। দক্ষিণ রাঢ়ের এই ভুরশুট পরগণা একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। ষোড়শ-শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এখানে ইসমাঈল গাজীকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল একটা পীরস্থান। আর এই পীরস্থানকে উপলক্ষ ক'রে ইসমাঈল গাজী অথবা বড় খাঁ গাজীর প্রেরণায় ভুরশুট ইসলামী সাহিত্যের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানকার ইসলামী সাহিত্যের ভাষায় বিশিষ্টতা দেখা গেল। সেটা হ'ল ফারসী-উরদু-হিন্দী শব্দ বাহুল্য। (সুকুমার সেন: ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১৩৫৮, পৃ: ১০৬)। কবি সৈয়দ হামযা এই ভুরশুটেই জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি প্রথমে মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষায় এবং পরে মুসলমানী বাংলায় [দোভাষী বাংলায়] অন্যান্য কাব্য প্রণয়নে যত্নবান হন। বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের নিবাস ছিল ভুরশুটের উপকণ্ঠে বসন্তপুরে।

৪ "The author's in these three works it was stated that he was the son of Mir Hidayet Ullah, and grand-son of Abdul Qadir, a native of Udina,

মঈনুদ্দীন মোল্লা ছিলেন গুণীর সমঝদার। তাঁর বাড়িতে কবি সপরিবারে বাস ক'রে নিশ্চিন্ত পরিবেশে সাহিত্যচর্চার সুযোগ পান এবং সেখানে তাঁর জীবনের আঠারটি বৎসর অতিবাহিত হয়। কবি বসন্তপুরে এই মঈনুদ্দীন মোল্লার বাড়িতে সম্ভবতঃ শিক্ষকতা করতেন; এবং সেখানে শিক্ষকতার সুযোগে তাঁর বহুল প্রচলিত কাব্যগুলি রচনা করবার অবকাশ পান। হামযা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে কাব্যের বহুস্থলে মঈনুদ্দীন মোল্লা, কালু মোল্লা, চাঁদ মোল্লা প্রমুখ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[৫] প্রধানতঃ এঁদের জন্যই কবি বৃদ্ধ বয়সেও একাগ্রচিত্তে কাব্য রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

---

village in the Bhursut Parganah of the district of Bardwan. He had two sons, Kalim-al-Din and Qutb-al-Din. The three books were written at Basantapur in Parganah Bhursut, where he had resided for 18 years." (Catalogue of the Bengali and Assamese Mss. in the library of the Indian office, Oxford University Press, 1924 pp. 13-14.)

৫ ক] আল্লা মেহেরবান থাকে হামেসা আবাদ রাখে
মইনুদ্দি মোল্লার খানদান।
যাহার মহব্বত পরে ভুরশুট বসন্তপুরে
হয় মেরা মুর্দত গোজরাণ॥
নূর মোহাম্মদ আর চাঁদ মোল্লা ভাই তার
কায়েম মোকাম যেন থাকে।
ফরজন্দ সহিত সবে আপনা মেহের ভাবে
আল্লাতালা নেওয়াজিয়া রাখে॥
এ ভাই ভাতিজা আর যত আছে দোস্তদার
সবাকারে রাখিও নেওয়াজিয়া।
যে জন আমার পরে হামেসা মেহের করে
নানা রূপে মহব্বত দিয়া॥

খ] কালু মোল্লা লেখাইল করিয়া নেহারা।
চান্দ মোল্লা শুনিলেন পাগলের পারা॥

১৩২৩ সালের য় বর্ষ, পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'আল্-ইসলাম' পত্রিকায় জনৈক শেখ আবদুর রহমান, সৈয়দ হামযা সম্পর্কে যে বিবরণ[১] লিখেছেন, তা সংক্ষিপ্ত করলে এই দাঁড়ায় ঃ কবি বাল্যকালে ছিলেন অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির। যথা সময়ে তাঁর লেখা-পড়া শুরু হয় এবং বিদ্যাচর্চাকালে কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি ফারসী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। বাল্যকালেই হামযা কবিতা রচনার দিকে মনোযোগী হন এবং বহুসংখ্যক ছড়া, পাঁচালী রচনা করেন। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। কবি প্রথমে 'মধুমালতী' কাব্যরচনায় মনোযোগী হন। এই সময়ে হঠাৎ তাঁর পিতা মারা গেলে পিতৃশোকে শোকাকুল কবি গমন করেন হাওড়া-হুগলী জেলার সীমান্তবর্তী বসন্তপুরে মেহ্দী (মঈনদ্দীন) মোল্লার বাড়িতে। ফলে, কিছুকাল 'মধুমালতী' কাব্যের রচনা-কার্য বন্ধ থাকে। কবি সেখানে প্রায় বিশ বছর শিক্ষকতা করেন এবং 'জৈগুনের পুঁথি', 'আমীর হামযা' (২য় বালাম) ও 'হাতেমতাঈ' লেখেন। নিজের সম্পত্তি তদারকের জন্য কবি মাঝে মাঝে যেতেন উদনায়। ১২১১ সালে বসন্তপুরের কাজ ত্যাগ ক'রে তিনি উদনায় ফিরে আসেন। তিনি এখানে বাস করেন ১২১৪ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হ'লে তাঁর কতিপয় ছাত্রের অনুরোধে কবি ১২১৪ সালে পুনরায় উদনা থেকে গমন করেন বসন্তপুরে; এবং সেখানে তিনি দেহত্যাগ করেন।

সৈয়দ হামযা সম্পর্কে পূর্বোক্ত লেখক শেখ আবদুর রহমানের লিখিত বিবরণের সঙ্গে কবির বিভিন্ন কাব্যে প্রদত্ত বিক্ষিপ্ত অংশগুলির তুলনা ক'রলে অনেক বিষয়ে গরমিল লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হ'ল। সৈয়দ হামযা তাঁর কাব্যের একস্থলে সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন ঃ

রসুলের পাও তলে সৈয়দ হামযা বলে
ঘর ছিল ভুরশুট পরগণা।

---

তালেবের লোক যেয়ছা কেচ্ছাকে রাখিয়া।
রাত কালে কেচ্ছা শুনে পালঙ্কে শুইয়া।
এই সবাকার সাথে বড় মহব্বত।
রাখিনু আপনা সাথে শুন হকিকত।

১ 'বঙ্গের আদি কবি সৈয়দ হামযা ও সাহিত্য পরিষৎ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সন নিরানই সালে আমার কপাল ফলে
বাড়ীতে পড়িল তিন হানা ॥
চাষবাস যত ছিল বাড়ীঘর সব গেল
ভরাডুবি হইল মাঝ মাঠে।
দেলেতে আফসোস বড়া হইয়া যে গাঙ্‌ছাড়া
পরগণা বায়েড়া রাণাঘাটে ॥

কবির বায়েড়া পরগণার 'রাণাঘাটে' যাবার কথা প্রবন্ধকার কোথাও উল্লেখ করেন নি। শেখ সাহেবের রচনাটি সৈয়দ হামযার ব্যক্তিগত জীবন ও কাব্যসাধনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করে বটে ; কিন্তু কবি-জীবনের অনেক কথাই যে তিনি উদ্‌ঘাটন করেন নি, তা স্বীকার করতে হয়। বিভিন্ন কাব্যে কবির একাধিক উল্লেখ দৃষ্টে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তিনি বিপদে-আপদে পতিত হ'লে বরাবরই উদনা (উদ্‌না) থেকে আশ্রয় নিয়েছেন বসন্তপুরে। কিন্তু একবার (সন১১৯৯) এমনও হয়েছে যে, সে সময়ে কবি বসন্তপুরে যাননি, গেছেন বায়েড়া পরগণার রাণাঘাটে। এ-কথা অনুমান করলে অসঙ্গত হবে না যে, রাণাঘাটে সৈয়দ হামযার কাব্যচর্চা অব্যাহত ছিল—কিন্তু রাণাঘাটের জীবনযাত্রার বা অন্যকোন প্রসঙ্গে কবি সব সময়েই নীরব রয়েছেন। দামোদরের বন্যার কবলে কবলিত ও বিপর্যস্ত হওয়ায় 'দেলেতে আফসোস বড়া' হয়েছেন কবি এবং নিরাপত্তার জন্য রাণাঘাটে (বায়েড়া পরগণায়) গেছেন 'গাঙ্‌ছাড়া' হয়ে, শুধু এই খবরটুকুই পরিবেশন করেছেন, অথচ যেটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য অর্থাৎ স্বদেশ পরিত্যাগ ক'রে প্রবাস জীবন-যাপনের ফলে কবি-জীবনের উপর তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কি হ'ল, সেইটি তিনি কাব্যের মধ্যে কোথাও উল্লেখ করেন নি। এতৎসত্ত্বেও, কবির নিজস্ব রচনা এবং অন্যান্য লেখকদের আলোচনা থেকে কবির জীবন ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে অনেক তথ্য উদ্ধার ক'রতে পারা যায়। কবিকে বুঝবার পক্ষে এগুলো অপর্যাপ্ত নয়।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সৈয়দ হামযার জীবৎকাল নির্ণয় সম্পর্কে বলেছেন যে, কবি ১৭৫৫ থেকে ১৮১৫ (?) খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন।[১] কিন্তু কবির

১ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য। পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃঃ ২৯৩।

জীবন-কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। কবি তাঁর কাব্যগুলির রচনা-কাল এমন সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তার সাহায্যে কবির আবির্ভাব-কাল পেতে কোন অসুবিধা হয় না। কবি 'হাতেম তাঈ'-এর শেষের দিকে ( পৃঃ ২৭৩ ) কাব্য-সমাপ্তি কালে নিজের বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন। কবি বলেছেন ঃ

এমন জইফ কালে কালু মোল্লা মেরা গলে
লাগাইল মহব্বতের ফাঁসি।
আপনি পরম সুখে বসিয়া তামাসা দেখে
মরি আমি ক'রে কষাকষি ॥
নহেত এমন কালে কে কোথা কবিতা বলে
সত্তর সাল বয়স যাহার।
এই কামে দিন গেল নিজ কাম না হইল
আছে মাত্র ভরসা আল্লার ॥

( হাতেমতাঈ )

উপরের উৎকলিত কবিতাংশে কবির উক্তি স্পষ্টে লক্ষ্য করা যায়, 'হাতেমতাঈ' কাব্য রচনার সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৭০ বৎসর। সত্তর বৎসর বয়সে সৈয়দ হামযা এ-কাব্য লেখার কাজ শেষ করবার সময় যে রচনা-কাল দিয়েছেন, তাও তাঁর কাব্য মারফত জানা যায়। কবির উক্তি ঃ

এক শও একুশ লিখে তার পিঠে শূন্য রাখে
সনের ঠিকানা পাবে তায়।
বাঙ্গালা আখেরি সালে গরমীর বাহার কালে
পুঁথির তারিখ লেখা যায় ॥

( হাতেমতাঈ, পৃঃ ২৯৮ )

এই তারিখ হ'ল ১২১০ সাল অর্থাৎ ইংরেজী ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ে সৈয়দ হামযার বয়স তাঁর নিজের উল্লেখ অনুসারে যদি ৭০ বৎসর হয়, তাহলে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ( ১২১০ — ৭০ = ) ১১৪০ সালে অর্থাৎ ইংরেজী ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।

অতএব, কবির জন্ম তারিখ বাংলা ১১৪০ সাল ( ১৭৩৩ খ্রীঃ )। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত গ্রন্থে এই সময় কালই গ্রহণ করা হয়েছে।[২]

আরও একটি উৎস মারফত কবির জন্মের এই সময়কাল পাওয়া যাচ্ছে। কবির জীবনী লেখক তাঁর প্রবন্ধের একস্থানে বলেছেন "১১৫৭ সালে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হামযার পরিণয়-ক্রিয়া সুসম্পাদিত হয়"[৩] লেখকের মতে ১১৫৭ বঙ্গাব্দে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে যদি কবির বিবাহ হয়, তাহ'লে এই সময় থেকে আঠার বৎসর পিছিয়ে দিলে কবির জন্মকাল পাওয়া যাবে। অতএব, তাঁর জন্মকাল দাঁড়ায় ( ১১৫৭-১৮ ) = ১১৩৯ বা ১১৪০ সাল ( ১৭৩৩ খ্রীঃ )। এ সম্বন্ধে মত-ভেদের অবকাশ নেই।

কবি কোন্ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সে বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় নি। তবে, এ-বিষয়ে একটা সময়ের উল্লেখ করেছেন শেখ আবদুর রহমান। ইনি লিখেছেন, "একটি ব্যাধির প্রকোপে ভগ্নস্বাস্থ্য হইলে বসন্তপুরের কয়েকটি ছাত্র ও অনুগ্রাহকবর্গের সনির্বন্ধ অনুরোধে ১২১৪ সালের প্রথমে তিনি পুনরায় বসন্তপুরে যাত্রা করেন। ইহার পরে আর তাঁহাকে উদানা জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় নাই। ১২১৪ সালে এতদ্দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া এই অমর কবি অমরধামে গমন করেন।[৪]

শেখ সাহেবের মতে সৈয়দ হামযা ইন্তিকাল করেন ১২১৪ সালে অর্থাৎ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর এই মতামত গ্রহণযোগ্য কিনা বিচার্য। আমরা ইতিপূর্বে 'হাতেম-তাঈ'-এ উৎকলিত কাব্যাংশ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, 'হাতেমতাঈ'-এর রচনা-কার্য শেষ করার সময় কবি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন ; কর্মশক্তি ও উদ্যম হারিয়ে ফেলেছেন ; শুধু কালু মোল্লার মহব্বত ও স্নেহ-মমতার কথা ভেবে তিনি তখনও ৭০ বৎসর বয়সে কাব্যচর্চা অক্ষুন্ন রেখেছেন যে-বয়সে তাঁর এবাদত বন্দেগী করার কথা। এই জন্যই কবি বলেছেন :

---

২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ঢাকা, ১৯৫৬, পৃঃ ২৫।

৩ শেখ আবদুর রহমান : বঙ্গের আদি কবি সৈয়দ হামযা ও সাহিত্য পরিষৎ। আল ইসলাম ১৩২৩, ২য় বর্ষ, পৌষ-মাঘ সংখ্যা পৃঃ ৫২৪।

৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২৫।

এমন জইফ কালে কালুমোল্লা মেরা গলে
লাগাইল মহব্বতের ফাঁসি।
নহেত এমন কালে কে কোথা কবিতা বলে
সত্তর সাল বয়স যাহার ॥

লক্ষ্য করবার বিষয়, কবি 'সত্তর' বছর বয়সে 'হাতেমতাঈ' লিখেছেন। কিন্তু কোন সময়ে? কবির মতে সে হ'ল পূর্বোক্ত বাংলা ১২১০ সাল। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ১২১০ সালে কবির বয়স ছিল ৭০ বৎসর। সত্তর বছরের বৃদ্ধ (কবির ভাষায় 'জইফ') কবির তখন শারীরিক অবস্থা যে বিশেষ ভাল ছিল না এবং তখন থেকেই যে তিনি পরকালের মুক্তি-চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন, কবির বিভিন্ন উক্তি অনুসারে তা স্পষ্টরূপে বুঝা যাচ্ছে। সুতরাং কবির মৃত্যুর সময়কাল যদি ১২১৪ সাল (প্রবন্ধকারের মতানুসারে) ধরা হয়, তবে দেখা যায় 'হাতেমতাঈ' রচনা শেষ করার (১২১০ সালে) পর সৈয়দ হামযা বেঁচেছিলেন আরও চার বৎসর। কবির উক্তি মতে, ১২১০ সালে সত্তর বছর বয়সে তিনি যেভাবে শারীরিক অসুস্থতা ও বার্দ্ধক্যজনিত পীড়ায় ভুগ্‌ছিলেন, তাতে তাঁর ১২১৪ সালে (১৮০৭ খ্রীঃ) ইন্তিকাল করা অসম্ভব নয়। বরং ১২১০ সালের পর কবি যদি বেশীদিন বেঁচে থাকতেন, তাহলে সেটা স্বাভাবিক বলে মনে হতো না। অবশ্যি বার্দ্ধক্যজনিত পীড়া ও শারীরিক অসুস্থতায় ভুগেও কোন কোন মানুষ বেশীদিন বাঁচতে পারে বটে, তবে কবি-বর্ণিত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১২১৪ সালে অর্থাৎ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছিলেন ব'লে আমাদের নিশ্চিত ধারণা। অতএব, সৈয়দ হামযা অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭৩৩ খ্রীঃ) আবির্ভূত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় (১৮০৭ খ্রীঃ) মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সৈয়দ হামযা 'আমীর হামযা' কাব্যের 'দোসরা বালাম' রচনা করতে গিয়ে তাঁর কাব্য-গুরু ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন ও তাঁর প্রতি নিবেদন করেছেন গভীর শ্রদ্ধা। কবি উক্তি :

আল্লার মকবুল শাহা গরিবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফিজপুর যাহার মোকাম ॥
আছিল রওশন দেল শায়েরী জবান।

যাহাকে মদদ গাজী শাহা বড়ে খান ॥
শায়েরী করিলেন পুঁথি আমীর হামযার।
না ছিল কেতাব রুজু তামাম কেচ্ছার ॥
তামাম কেতাব যদি পাইতেন দেওয়ান।
গাঁথিত কবিতা হার মুক্তার সমান ॥
যতদূর আছে তার কবিতার হার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক হয় জারেজার ॥
আমার তকছির মাপ করিবেন দেওয়ান।
তবেত সায়ের মেরা পায় জিউ দান ॥
পীর শাহা গরিবুল্লা কবিতায় গুরু।
আলমে উজালা যার কবিতার শুরু ॥

(আমীর হামযা—২য় বালাম)

ফকীর গরীবুল্লাহ্ সম্পর্কে সৈয়দ হামযার স্পষ্ট উক্তি এই পর্যন্তই। গরীবুল্লাহ্ যে, সৈয়দ হামযার কাব্য-গুরু বা ওস্তাদ ছিলেন, উপরোদ্ধৃত অংশটি তার নির্দেশক। কিন্তু তাঁদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল কি না, সে সম্পর্কে সৈয়দ হামযা কিছু উল্লেখ করেন নি বা কোন ইঙ্গিত দেন নি যেমন দিয়েছেন উড়িষ্যার বালেশ্বর নিবাসী কবি আবদুল মজিদ খাঁ ভুইঞা[১] 'রঙ্গ বাহার' কাব্যে। আবদুল মজিদ এ-কাব্যে সৈয়দ হামযাকেই কাব্য-গুরু বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ঃ

যত আছে দীনদার মোরসেদ ও বাপ আর
বন্দি আমি ওস্তাদের পায়।
ভুরশুট পরগণা বিচে উদনা বসতি আছে
তার মধ্যে সৈয়দ হামযায় ॥

---

১ আবদুল মজিদ খাঁ ভুঁইঞা ছিলেন বাদশাহী আমলের জমিদার বংশের ছেলে। তাঁর নিবাস ছিল উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার গড়পদ্দা পরগণায়। ইনি 'রঙ্গ বাহার' কাব্য রচনা করেন ১২৭০ সালের আষাঢ় মাসে। (ডঃ সুকুমার সেন: ইসলামি বাংলা সাহিত্য, বর্ধমান সাহিত্য সভা, বর্ধমান, ১৩৫৮, পৃঃ ১৩৮)

কবিতা করিনু শুরু সেই সে আমার গুরু
মোলাকাত নাহি মেরা সাথে।
তার ধ্যান মনে রাখি কেতাবে ছেফত দেখি
হাতেমতাঈর কেচ্ছা হৈতে ॥
আল্লাতালা তার তরে বেহেস্ত নসিব করে
ওফাত হৈয়াছে বহুকাল।[২]

এ-উক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে, সৈয়দ হামযার সঙ্গে আবদুল মজিদ খাঁ ভুঁইঞার সাক্ষাৎ-পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও ভুঁইঞা সাহেব সৈয়দ হামযাকে কাব্য-গুরুরূপে বরণ করেছেন। এখন প্রশ্ন হ'ল, সৈয়দ হামযার সঙ্গে তাঁর কাব্য-গুরু বালিয়া পরগণার অন্তর্গত হাফিযপুরের তত্ত্বদর্শী-কবি ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল কি না? আমরা দেখতে পাচ্ছি, গরীবুল্লাহ্ তাঁর 'সোনাভান' কাব্য প্রণয়ন করেন ১১২৭ সালে। কারণ কবি বলেছেন ঃ

১১২৭ সালে বাংলা মাঘ মাসে।
সোমবারের বাদ আছর ফকিরেতে ভাষে ॥

কিন্তু সৈয়দ হামযার জন্ম হয় ১১৪০ সালে ; অর্থাৎ গরীবুল্লাহ্‌র 'সোনাভান' লেখার অন্ততঃ ১৩ বৎসর পরে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ১১২৭ সালে 'সোনাভান' কাব্য রচনার সময় গরীবুল্লাহ্‌র বয়স ৩০ বৎসর, তাহ'লে সৈয়দ হামযার জন্ম সময়ে গরীবুল্লাহ্‌র বয়স ছিল (৩০ + ১৩) = ৪৩ বৎসর। এই হিসেবে সৈয়দ হামযার বয়স যখন ৩০ বৎসর, তখন গরীবুল্লাহ্‌র বয়স ছিল (৩০ + ৪৩) = ৭৩ বৎসর। সে সময়ে বা তার পরেও গরীবুল্লাহ্ বেঁচে থাকলে গুরু-শিষ্যের মধ্যে সাক্ষাৎ-পরিচয় থাকা অসম্ভব নয়। আর পরিচয় না থাকলেও সৈয়দ হামযা গরীবুল্লাহ্‌কে কাব্য-গুরু হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন বটে। তার প্রমাণ আবদুল মজিদ খাঁ ভুঁইঞা।

---

২ ডক্টর সুকুমার সেনের 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৩৭।

## ॥ কবি-রচিত কাব্য ॥

সৈয়দ হামযা মোট ক-খানি কাব্য প্রণয়ন করেছিলেন, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। পাদ্রী J. Long সাহেব তাঁর পুস্তক-তালিকায় সৈয়দ হামযার তিনখানি পুঁথির নাম উল্লেখ করেছেন। পুঁথিখানি হল—'আমির হামযা' (২য় বালাম), 'জৈগুনের পুঁথি' ও 'হাতেমতাঈ' এগুলি সে সময়ে বটতলা থেকে প্রকাশিত পুঁথিগুলির অন্তর্গত।[১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ও ডক্টর সুকুমার সেন কবির চারখানি কাব্যের কথা বলেছেন।[২] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন যে, কবি পাঁচখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি অন্যান্য চারখানি কাব্যের সঙ্গে 'সোনাভান' কাব্যকেও সৈয়দ হামযার রচনা বলে মনে করেন।[৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে সৈয়দ হামযার চারখানি কাব্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[৪] প্রকৃতপক্ষে, সৈয়দ হামযা ক'খানি কাব্য প্রণয়ন করেছিলেন, এ প্রশ্নের সমাধান হবে তাঁর নিজের লিখিত উক্তি থেকে। কবি তাঁর সর্বশেষ কাব্যে (হাতেমতাঈ) তৎরচিত কাব্যগুলির নাম উল্লেখ করেছেন। কবি বলেছেন ঃ

কেচ্ছা মধুমালতীর জঙ্গনামা আমিরের
জৈগুন পুঁথি লিখেছিনু আগে।
আল্লাতালা ভাল করে যাহার খায়েশ পরে
হাতেম লিখিনু শেষভাগে ॥

(হাতেমতাঈ)

কবি-রচিত উপরোক্ত অংশ থেকে কবির কাব্যগুলির নাম ও সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে ; তার ফলে সকল দ্বন্দ্বের নিরসন হচ্ছে। 'সোনাভান' পুঁথি বাজারে

---

১ J. Long : A Descriptive Catalogue of Bengali works. Calcutta—1855.

২ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ঃ সৈয়িদ হামযা, দিলরুবা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩। এবং ডক্টর সুকুমার সেন ঃ ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১০৯-১১২।

৩ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ১৯৫৭, পৃঃ ২৯৪।

৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ১ম সংস্করণ, ঢাকা. ১৯৫৬. পৃঃ ২৫।

সৈয়দ হামযা[৫] অথবা মুন্সী ফকীর মোহাম্মদের[৬] নামে প্রচলিত। এর মূলে রয়েছে প্রকাশকদের কারসাজী বা তাঁদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মতৎপরতা।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেবও এই মতই পোষণ করেন।[৭] বাজার সংস্করণ 'সোনাভান' সৈয়দ হামযার নামে প্রচলিত থাকলেও আমরা কাব্যের মধ্যে কোথাও তাঁর নাম বা ভণিতা পাই না, বরং ভণিতা রয়েছে ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র।[৮] সুতরাং 'সোনাভান' কাব্য সৈয়দ হামযার লেখা নয়।

অতএব কবি-রচিত কাব্যগুলির সংখ্যা চার। যথা ঃ

ক) মধুমালতী

খ) আমীর হামযা (২য় বালাম)

গ) জৈগুনের পুঁথি

ঘ) হাতেমতাঈ

## ॥ কাব্যাদির উৎস ॥

সৈয়দ হামযার 'মধুমালতী' প্রেমমূলক রোমান্টিক কাহিনী কাব্য। এ-কাব্য রচনার মূলে রয়েছে ফারসী বা হিন্দী কাব্যের পটভূমি। এটি মৌলিক রচনা না হলেও কবির মৌলিকতার নিদর্শন আছে। তবে, মনুহর-মধুমালতীর এই রোমান্টিক উপাখ্যানটি কবির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বেশ কয়েকজন বাঙালী কবির বদৌলতে বাংলা সাহিত্যেও বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। সৈয়দ হামযার পূর্বসূরী কোন কোন কবি 'মধুমালতী'-র প্রণয় ঘটিত রোমান্টিক কাহিনীটি গ্রহণ করেছিলেন খুব সম্ভব ফারসী বা

---

৫ সৈয়দ হামযা ঃ সোনাভান। সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬।

৬ মুন্সী ফকীর মোহাম্মদ ঃ ছহি বড় সোনাভান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১।৫।৫৪

৭ পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ্। মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৬১, পৃঃ ২৮।

৮ ভণিতাগুলি নিম্ন প্রকার। যথা ঃ

ক) অধীন ফকির বলে রছুলের পাও তলে
মিছে কামে গেল এ জীবন।

হিন্দী-অবধি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলো থেকে। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল প্রধানতঃ ধর্মভিত্তিক। হিন্দু কবিগণ যেমন যুগপ্রচলিত আদর্শে ধর্মীয় কাহিনীমূলক কাব্যাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তেমনি মুসলমান কবিদের রচনায়ও পড়েছিল ধর্মীয় ছাপ। এই সময়ে মানুষের ভূমিকা ছিল গৌণ। কাজেই, কবিদের চোখে বিধৃত সেকালের জীবন ছিল সর্বতোভাবে অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। হিন্দুরা যেমন 'হরিবংশ' লিখেছেন, শ্রীকৃষ্ণবিজয় লিখেছেন, তেমনি মুসলমানেরা তাঁদের স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুকে সাহিত্যে রূপায়িত করতে গিয়ে হিন্দুদের পুরাণ-পাঁচালীর কাঠামোতে গড়ে তুললেন 'নবীবংশ', 'রসুলবিজয়', 'মোহাম্মদ বিজয়' প্রভৃতি।[১] ধর্মীয় গতানুগতিকতার শৃঙ্খল থেকে বাংলা কাব্য সাহিত্যকে যাঁরা মুক্ত করেছিলেন, তাঁরা তার জন্য অনুপ্রেরণা ও উপাদান পেয়েছিলেন বাংলাদেশের বাইরে থেকে, পাক-ভারতের হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চল ও ঈরাণ থেকে, কারণ অনেক আগেই সে-সব স্থানে রোমান্টিক কাব্যরচনার বুনিয়াদ পাকা হয়ে গিয়েছিল।[২] বাংলা রোমান্টিক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে হিন্দী ধারা ছিল পারস্যের ঈরাণীধারার ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ।[৩]

রোমান্টিক হিন্দী কাব্যগুলির মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুহম্মদ জায়সীর (অনুমান মৃত্যু ১৫৪২ খ্রীঃ) 'পদুমাবৎ' অন্যতম। জায়সী তাঁর 'পদুমাবৎ' কাব্যে

---

খ) ১১২৭ সালে বাংলা মাঘ মাসে।
সোমবারে বাদ আছর ফকিরেতে ভাষে॥

গ) গরীব রচিল পুঁথি ফাতেমার পায়।

ঘ) অধীন ফকির বলে রছুলের পদতলে॥

১ মুহম্মদ আবদুল হাই: ভাষা ও সাহিত্য, ১৩৬৬, পৃঃ ১৭৬।

২ ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার: বাংলা রোমান্টিক কাব্যে হিন্দী অবধি পটভূমি। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ৬।

৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬।

কতকগুলি লৌকিক প্রেমগাথার উল্লেখ প্রসঙ্গে 'মধুমালতীর' কথা বলেছেন। জায়সী লিখেছেন ঃ

সাধ কুঅঁর গংধাবতি জোগূ।
মধুমালতি কহঁ কীন্হ বিওগূ॥[৪]

[ অর্থ ঃ কুমার গন্ধাবৎ যোগ সাধন করল।
মধুমালতীর জন্য সে অনেক বিরহ সইল ॥ ]

যতদূর মনে হয়, 'মনুহর-মালতী'র কাহিনী নিয়ে হিন্দীতে প্রথম কাব্য লেখেন মীর মনঝন নামক এক হিন্দী কবি। মীর মনঝন এটি প্রণয়ন করেন ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই উপাখ্যান নিয়ে কাব্য রচনার রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেল পরবর্তী দুশো বছর।[৫] হিন্দীতেই শুধু নয়, ফারসীতেও এই উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্য-রচনার প্রমাণ মিলছে।[৬] সম্ভবতঃ ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দী 'মধুমালতীর' ফারসী তর্জমা করেন নাসির আলী। এলাহাবাদের সুবাদার মীর আশকারীও হিন্দী 'মধুমালতীর' ফারসী অনুবাদ করেন ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর কাব্যের নাম মীর ও মা ( Mihr-o-Maa ).[৭] শেখ নূর মোহাম্মদ নামক জনৈক কবি কর্তৃক ফারসীতে রচিত 'মধুমালতী' উপাখ্যানের একখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে।[৮] এই প্রেম-কাহিনীকে কেন্দ্র করে দাক্ষিণাত্যের ( বীজাপুর ) সুলতান আলী আদিল শাহ্‌র সভাকবি শেখ নুসরত 'গুলশান-ই-ইশ্‌ক' লেখেন সপ্তদশ শতাব্দীতে; এবং এই সময়েই আর এক খানি 'মধুমালতী' পাওয়া যাচ্ছে, এটি চতুর্ভুজ দাসের লেখা।[৯] এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীতেও

---

৪ পদুমাবতী: Bibliotheca Indica ed. Canto XXIII, p. 512.

৫ ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার: পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।

৬ ডক্টর সুকুমার সেন: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৪৮, পৃঃ ১০৪৪।

৭ অধ্যাপক আহমদ্‌ শরীফ সম্পাদিত: মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী', পৃঃ ঝ।

৮ ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার: পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮ ও Catalogue of the Persian Mss in the Behar library, I, No 395, p. 288-89.

৯ ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার: পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।

( ১৭৫৯ খ্রীঃ ) উপাখ্যানের ভিত্তিতে এই ধরণের হিন্দী কাব্য রচিত হয়েছিল ব'লে ডক্টর সুকুমার সেন জানান।[১০] যাই হোক, হিন্দী বা ফারসী কাব্য-গুলির বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরীর ভূমিকা আছে ; এটি ঈরাণী ভাবধারার প্রভাবের ফল। ভারতীয় ভাষায় কল্পনাশ্রয়ী কাহিনী প্রবর্তন আরবী ফারসী সাহিত্যের অনুপ্রেরণা থেকেই হয়েছে, এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই। মুসলমানগণ এ-সাহিত্য সঙ্গে ক'রে পাক-ভারতে এসেছিলেন। এ ভাষাদুটিতে বিশেষ করে ফারসীতে ঘটনা বহুল রোমান্টিক কথা ও কাহিনীর সম্পদ্ অসাধারণ।[১১] যাহোক, হিন্দী বা আরবী-ফারসী সাহিত্যের উপাখ্যান অবলম্বনে প্রণয়-ঘটিত রোমান্টিক আবেগ ও গতিবেগ বাংলা সাহিত্যে আমদানী করলেন একাধিক বাঙালী কবি। বাংলা ভাষায় 'মধুমালতী' আখ্যান অবলম্বনে প্রথম কাব্য রচনার গৌরব কার প্রাপ্য তা বলা শক্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল এই উপাখ্যান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন ; কাজেই তিনি 'সতী ময়না বা লোর চন্দ্রানী' রচনার সময় একস্থানে ( আলাওলের রচিত অংশের মধ্যে ) বলেছেন ঃ

মধুমালতীর লাগি বিবাগী হইয়া।
মনোহর গেল মাও বাপ তেয়াগিয়া ॥[১২]

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে 'মধুমালতী'র উপাখ্যান নিয়ে যাঁরা কাব্য রচনায় তৎপর হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নাম জানা যাচ্ছে মুহম্মদ কবীর, মুহম্মদ চুহর, সৈয়দ হামযা, সাকের মাহ্‌মুদ, গোপীনাথ দাস, জোবেদ আলী ও নূর মোহাম্মদের। একই কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন যুগে ( সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ) বিভিন্ন কবি কাব্য রচনা করেছিলেন ; এসব থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, পাক-বাংলা তথা পাক-ভারতে এ-কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল বাঙালী কবিদের মধ্যে এ-পর্যন্ত

১০ ইসলামি বাংলা সাহিত্য, বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৫৮, পৃঃ ৪১।

১১ ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বকাওলী। সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা ১৩৬৪, পৃঃ ৩।

১২ ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড ( ১৯৪৮ ) থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৮৬২।

যাঁদের নাম জানা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে সম্ভবতঃ মুহম্মদ কবীর মধুমালতীর প্রণয়োপাখ্যান নিয়ে প্রথম কাব্য লেখেন। কিন্তু কাব্যখানি তিনি ফারসী, না হিন্দী—কোন্ কাব্যের অনুসরণে রচনা করেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত কবি কাব্যের দুটি ভণিতায় বলেছেন যে, এটি ফারসী থেকে অনূদিত ; আবার কাব্যের উপসংহারে উল্লেখ করেছেন, তাঁর 'মধুমালতী' হিন্দী কাব্য অবলম্বনে লিখিত [১৩] চট্টগ্রামের কবি মুহম্মদ চুহর তাঁর পীর মতিউল্লাহ্‌র আদেশে 'মনোহর মধুমালতী' রচনা করেছিলেন।[১৪] এঁদের পরবর্তী কবিদের মধ্যে আমাদের আলোচ্য কবি সৈয়দ হামযার 'মনোহর মধুমালতী' কাব্যখানি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ হামযা তাঁর এ-কাব্যখানি ফারসী, না হিন্দী কোন্ কাব্যের অনুসরণে রচনা করেন তদ্বিষয়ে স্পষ্টভাষায় কোথাও কিছু বলেন নি। তবে, তাঁর রচিত 'মধুমালতী'র সঙ্গে মুহম্মদ কবীরের "মধুমালতী"র তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, উভয় কবির কাব্যের পাত্র-পাত্রী ও স্থানের নামের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল রয়েছে বেশী। এতে মনে হয়, সৈয়দ হামযা তাঁর কাব্য রচনার জন্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ফারসী বা হিন্দী "মধুমালতী" [১৫]

সৈয়দ হামযার দ্বিতীয় রচনা 'আমীর হামযা' (২য় বালাম)। ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র 'আমীর হামযা'র (১ম বালাম) উত্তরাংশ লিখে তিনি তাঁর পূর্বসূরী ও ওস্তাদের অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করেন। খুব সম্ভব, কাব্যখানির আদর্শ ছিল কোন ফারসী কাব্য। 'আমীর হামযা' হযরত আলী ও মুহম্মদ হানিফা প্রমুখ মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে যে-সব রোমান্স ও উপকথা ফারসী মারফত পাক-ভারতে পৌঁছে আরও পল্লবিত হয়েছে, তার প্রায় সবই ঈরাণের সাফাবী আমলের লেখা।[১৬] হযরত রসূলুল্লাহ্‌র চাচা মহাবীর আমীর হামযাকে কেন্দ্র করে ফারসী 'শাহানামা'র ছাঁদে মোল্লা জালাল বালখী ফারসী গদ্য ভাষায় বিরাট 'দাস্তানে আমীর হামযা' রচনা করেছিলেন।[১৭] আমীর

---

১৩ অধ্যাপক আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত 'মধুমালতী' দ্রষ্টব্য। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত। (১৩৬৬ বাং) পৃষ্ঠা ৪, ৩০ ও ৫১।

১৪ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃঃ ২৩৮।

১৫ অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মধুমালতী' (মুঃ কবীরের) দ্রষ্টব্য, পৃঃ অ।

১৬ ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্: পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

১৭ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

হামযার যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে 'দাস্তান-ই-আমীর হামযা' নামক একখানি ফারসী কাব্য রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে, এ-কাব্যের রচয়িতা কে, এবং কোন্ সময়েই বা এটি লিখিত হয় তা জানা যায় না।

এই বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় যাঁরা কাব্য লেখেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম পাওয়া যাচ্ছে চট্টগ্রামের কবি আবদুল নবীর। তিনি ফারসী 'দাস্তান-ই-আমীর হামযা' অবলম্বনে একখানি সুবৃহৎ কাব্য প্রণয়ন করেন ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।[১৮] মোট ৮০ পর্বে বিভক্ত এই বিরাট 'আমীর হামযা' কাব্য রচনার মূলে ছিল ফারসী 'দাস্তান-ই-আমীর হামযা', তা কবি নিজেই বলেছেন তাঁর কাব্যের মধ্যে। কবির উক্তি:

আমীর হামযার কিচ্ছা ফারছি কিতাব।
না বুঝিয়া লোকের মনে ত পায় ভাব॥
বঙ্গে ত ফারছি না জানয়ে লোক সবে।
কেহ কেহ বুঝি কেহ ভাবে জেনা সোঁকে॥ (?)
এহি হেতু সেই কথা মুঞি রচিবার।
নিজ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুম অঙ্গীকার॥[১৯]

দোভাষী বাংলার পথিকৃৎ ফকীর গরীবুল্লাহ্ খুব সম্ভব ফারসী 'দাস্তান-ই-আমীর হামযা'র একখানি খণ্ডিত কাব্য পেয়েছিলেন। এ-কাব্য অবলম্বনেই তিনি বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করলেন আমীর হামযার ১ম বালাম।[২০] কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক্, তিনি কাব্যখানি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর অসমাপ্ত কাব্য যে-ব্যক্তির কাছে রক্ষিত ছিল সেই ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ে সৈয়দ হামযা সম্পূর্ণ ফারসী কাব্য অবলম্বনে উত্তরাংশ লিখলেন। গরীবুল্লাহ্‌র রচিত অংশের তুলনায় সৈয়দ হামযার রচিত অংশটি অনেকটা বড়।

কবির তৃতীয় কাব্যের নাম 'জৈগুনের পুঁথি'। ফারসী ও উরদূ সাহিত্যে অনেক ক'খানা কাব্য রচিত হয়েছে হযরত আলী ও তদীয় পুত্র মোহাম্মদ হানিফার

---

১৮ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ: ২১৭।

১৯ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য (১৯৫৭) থেকে উদ্ধৃত। পৃ: ২১৭-১৮।

২০ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্: সৈয়িদ হাময়া। দিলরুবা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩।

(ইবনুল হানাফিয়ার) যুদ্ধ সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে। তাঁদের যুদ্ধ-কাহিনী ইতিহাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও এই দুই ঐতিহাসিক মহাপুরুষের যুদ্ধ-বর্ণনায় কল্পনার আতিশয্য প্রবল। অতি মানবীয় বীরত্ব ও চাতুর্য, পরী-দৈত্যের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ ও আত্মীয়তা, যাদুবিদ্যার হরেক রকমের কসরত প্রভৃতি অলৌকিক বিষয়বস্তুর স্বাক্ষর রয়েছে এই ধরনের কাহিনীর মধ্যে। এই সব উপাখ্যানের মধ্যে মানুষ বা পরীর প্রণয় ও মিলনের ঘটনাও আছে। কিন্তু প্রণয়াবেগ কাহিনীর আসল বস্তু নয়। কাহিনীর মধ্যে নানা বিষয়ের অবতারণা আছে। নায়ক বহু বছর ধরে যুদ্ধ ও প্রেম-চর্চা করে, সে পৃথিবী তোলপাড় ক'রে বেড়ায় পুত্রপৌত্রবতী শতাধিক বৎসরের নায়িকার রূপ যৌবনে মুগ্ধ হয়ে। আবার এমনও দেখতে পাওয়া যায় যে, একাধিক পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও নায়ক অনেক সুন্দরীর প্রেমে বিনা দ্বিধায় তাদের পাণি গ্রহণ করেছে।[২১] এ সব ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। 'জৈগুনের পুঁথি'র কথাই ধরা যাক। এ কাব্যের নায়ক মোহাম্মদ হানিফা (ইবনুল হানাফিয়া) একাধিক নারীকে বিবাহ করেছেন যার সঙ্গে ইতিহাসের কোন মিল নেই। কবির কল্পনাই এর জন্য মূলতঃ দায়ী। ইবনুল হানাফিয়া একজন ঐতিহাসিক পুরুষ। তাঁর মৃত্যুর তারিখ ৮১ হিজরী বা ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন।[২২] সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক উবায়দুল্লাহ্ বিসমিল অমৃতসরী বলেন, মুহম্মদ হানিফা সাধারণতঃ 'ইবনুল হানাফিয়া' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম মুহম্মদ আকবর; ডাক নাম আবুল কাসিম এবং ইবনুল হানাফিয়া। তাঁর পিতা হযরত আলী ইবনে আবু তালিব এবং মাতা খাওলা বিনতে জাফর।[২৩] ইবনুল হানাফিয়াকে কেন্দ্র করে ফারসী ও উরদূ গদ্যে-পদ্যে গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। (এগুলির অনুসরণে

---

২১ ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্: পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩-৪।

২২ Gibb and Kramers: Shorter Encyclopaedia of Islam, 1953 p. 208. M. J. Degoeje ed.: A. T. Tabari, II, Series, II, Published in 1883-85.

২৩ মূল আরবী: "মুহম্মদ আল্ আকবর আল মুকান্নি বে আবিল কাশেম আল মা'সুরো বে ইবনুল হানাফিয়া উম্মুহু খুলা (খাওলা) বিনতে জাফর।" (উবায়দুল্লাহ্ বিসমিল অমৃতসরী: সওয়ানে উমরী হযরত আলী। ২য় সংস্করণ, হিজরী ১৩১৭, পৃঃ ৩২১)।

বাংলা ভাষায় কাব্য লিখেছেন কবি সাবিরিদ খান ও মুহম্মদ খান)। আর এই সঙ্গে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু কবিদের হাতে পড়ে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন: বোম্বাইয়ের কবি নূর-উদ্দীন[২৪] মুহম্মদ হানিফার যুদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে উরদূ ভাষায় কাল্পনিক কাব্য 'জঙ্গে জৈতুন' লেখেন।[২৫] কাব্যের রচনাকাল জানা যায় না। ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন উরদূ মসনবীতে 'কিসসা-এ-জায়তুন' (অথবা 'জঙ্গনামা মুহম্মদ হানিফ') নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন কবি ফজল বিন্ মুহম্মদ।[২৬] ফারসী গদ্য ভাষায় আর একখানি গ্রন্থ রচনার খবর জানা যায়। এটি লিখিত হয়েছে হযরত মুহম্মদ (দঃ) ও হযরত আলীর সঙ্গে 'জয়কুম বাদশার লড়াই' ও চান্দাল শাহ্‌র কন্যা 'জয়তুন বা জয়গুন পাক দামান বিবি'র যুদ্ধ ও প্রণয় কাহিনীকে ভিত্তি ক'রে।[২৭] এই ফারসী গদ্য পুস্তক খানির রচয়িতা বা রচনার তারিখ জানা যায় না। যাহোক, 'কিসসা-এ-জায়তুন' বা 'জঙ্গনামা মুহম্মদ হানিফ'-এর গল্পকাহিনী নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম কাব্য রচনা করেন কবি সৈয়দ হামযা।[২৮] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, সম্ভবতঃ কোন উরদূ পুস্তক অবলম্বনে সৈয়দ হামযা 'জৈগুনের পুঁথি' প্রণয়ন করেন; হিন্দুস্থানী যৈতুন বাঙ্গালায় জৈগুন হয়ে গেছে।[২৯]

সৈয়দ হামযার চতুর্থ ও শেষ কাব্য 'হাতেমতাঈ'। হাতেমতাঈ'-এর কাহিনী ফারসী ও উরদূ ভাষায় বিভিন্ন কবির দ্বারা লিখিত হওয়ায় ঈরাণ ও পাক-ভারতে জনপ্রিয় হয়েছিল খুব। হাতেমতাঈ ছিলেন প্রাক্-ইসলাম যুগের আরবের একজন কবি ও যোদ্ধা। তাঁর অতিথিসেবা, স্বার্থত্যাগ, পরোপকার ও অসমসাহসিকতার কাল্পনিক উপাখ্যান বাংলা পুঁথি-সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে ফারসী ও উরদূ কাব্যের মাধ্যমেই।

---

২৪ এঁর আদি নিবাস ছিল ভাবনগরে।

২৫ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্: সৈয়্যিদ হামযা। দিলরুবা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩।

২৬ ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্: পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

২৭ পূর্বোক্ত পৃঃ ১২।

২৮ পূর্বোক্ত পৃঃ ১২।

২৯ 'সৈয়্যিদ হামযা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। দিলরুবা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩।

ফারসী রোমান্টিক সাহিত্যে আরবের অবদান হলো হাতেমতাঈ-এর বদান্যতা ও সৌজন্যের কাহিনী, যাকে কল্পনাপ্রবণ ঈরাণ বহু বিচিত্র রঙে, রূপে-রসে পল্লবিত করেছে।[৩০] 'কিস্সায়ে হাতেমতাঈ' ফারসী ভাষার একখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ। আর এই জনপ্রিয় কাহিনীকেই বাঙালী কবি সৈয়দ হামযা বাংলা ভাষায় ঢালাই করেছেন উরদূ কাব্য 'আরায়েশ মাহ্ফিল'-এর মাধ্যমে। হামযা ছাড়া বাংলা ভাষায় 'হাতেম-তাঈ' কাহিনী অবলম্বনে কাব্য প্রণয়ন করেছেন কবি শাহাদৎ উল্লাহ্[৩১], শিবপুর নিবাসী কবি মুহম্মদ দানেশ[৩২], হিন্দু কবি গোবর্ধন দাস[৩৩] এবং আরও কেউ কেউ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যভাষায় কোন কোন লেখক 'হাতেমতাঈ' উপাখ্যান নিয়ে গ্রন্থাদি লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে, বর্ধমানের মহা-রাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ অপরের দ্বারা 'হাতেমতাঈ' উপাখ্যানের গদ্যানুবাদ করিয়ে-ছিলেন ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।[৩৪] মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব শাহাদৎ উল্লাহ্-রচিত খণ্ডিত কাব্যখানি পাবনা জেলা থেকে আবিষ্কার করেছেন[৩৫] এবং এ-কাব্যে হাতেমতাঈকে উপলক্ষ করে একটা চমৎকার উপাখ্যান সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় 'হাতেমতাঈ' কাব্যের প্রথম রচয়িতা হিসেবে গৌরব কার প্রাপ্য, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

সৈয়দ হামযার 'হাতেমতাঈ' উরদূ 'আরায়েশ মাহফিল' থেকে তরজমা করা। বাজার সংস্করণ 'ছহিবড় হাতেমতাঈ'-এর প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় এ-কথা স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে।[৩৬]

---

৩০ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্: পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩।

৩১ আহমদ শরীফ সম্পাদিত: পুঁথি-পরিচিতি, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃঃ ৬৩৪-৩৫।

৩২ ডক্টর সুকুমার সেন: ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১৩৫৮ বাং, পৃঃ ১১৮।

৩৩ ঐ : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৪৮, পৃঃ ৯৪৪।

৩৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৪২।

৩৫ আহমদ শরীফ সম্পাদিত: পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩১-৬৩৫।

৩৬ হামিদিয়া লাইব্রেরী প্রকাশিত। ঢাকা, ১৯৫৫, মে।

## । কাব্যগুলির রচনাকাল ॥

কবি-রচিত কাব্যগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে তাঁর চারখানি কাব্যের কথা বলা হয়েছে। কবির নিজের উল্লেখ অনুসারে দেখা যায় যে, তিনি 'মধুমালতী' কাব্য সর্বপ্রথম রচনা করেন। তৎপর 'আমীর হামযা' (২য় বালাম), জৈগুনের পুঁথি এবং সর্বশেষে 'হাতেমতাঈ' প্রণয়ন করেন।[৩৭] একমাত্র 'মধুমালতী' ব্যতীত সৈয়দ হামযা অন্যান্য কাব্যের মধ্যে পুঁথির রচনাকাল দিয়েছেন। কাজেই, সেইগুলির রচনা-কাল সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মধুমালতীর রচনা-কাল না দিলেও তিনি তাঁর রচনাগুলির উল্লেখ প্রসঙ্গে প্রথমে 'কেচ্ছা মধুমালতী'র নামই প্রদান করেছেন। এতে দেখা যায় তিনি এই কাব্যখানি মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রচনা করেন। কবির এক জীবনী-লেখক* বলেছেন যে, সৈয়দ হামযা 'মধুমালতী' লিখেছেন ১১৮৯-১১৯৫ সালের মধ্যে। (আল ইসলাম, ১৩২৩, ২য় বর্ষ, পৌষ-মাঘ সংখ্যা—পৃঃ ৫২৪) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই মতের পোষকতা করেছেন।[৩৮] লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই ছোট কাব্যখানির রচনা কার্য শেষ করতে কবির লেগেছিল প্রায় ৬।৭ বৎসর; এবং এই সময়ে বিশুদ্ধ সাধু ভাষাকেই তিনি অবলম্বন করেছিলেন। তখনও আরবী, ফারসী, উরদূ, হিন্দী ভাষায় তাঁর তেমন

---

৩৭ কেচ্ছা মধুমালতীর (১) জঙ্গনামা আমীরের (২)
জৈগুন পুঁথি (৩) লিখেছিনু আগে
আল্লাতালা ভাল করে যাহার খাহেশ পরে
হাতেম (৪) লিখিনু শেষ ভাগে॥

(হাতেমতাঈ)

* শেখ আবদুর রহমান।

৩৮ দিলরুবা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩।

ব্যুৎপত্তি জন্মে নি এবং ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র দোভাষী রীতিপদ্ধতি দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হন নি তখন পর্যন্ত।

দ্বিতীয় কাব্য 'জঙ্গনামা আমিরের' অর্থাৎ 'আমীর হামযার জঙ্গনামা' (২য় বালাম) লিখে তিনি শেষ করেন :

বারশত এক সালে আখেরি হেছাবে।
বারদিন ছয় মাস হেছাবেতে হবে॥
চান্দের তারিখ আজি পহেলা রমজান।
রোজার পহেলা রোজা রাখে মুসলমান॥
তারিখ করিনু বন্ধ বুঝে ভাল দিন।
আল্লা আল্লা বল ভাই তামাম মমিন॥
সৈয়দ হামজা বলে নবী পরওয়ার।
আল্লা মহাম্মদ বিনে গতি নাই আর॥

(আমীর হামজা—২য় বালাম)

১২০১ সাল অর্থাৎ ১৭৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আমীর হামযা'র রচনা (২য় বালাম) শেষ হলেও কবি কিন্তু এ কাব্য রচনার সূত্রপাত করেছিলেন কয়েক বৎসর পূর্বে, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। ফকীর গরীবুল্লাহ্‌ রচিত অসমাপ্ত আমীর হামযার (১ম বালাম) শেষাংশ রচনা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর ওস্তাদের কাব্য শেষ করতে হলে তাঁর (গরীবুল্লাহ্‌র) অনুসৃত রীতি-পদ্ধতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হ'য়ে সৈয়দ হামযা দোভাষী বাংলা রীতি রপ্ত করলেন এবং 'আমীর হামযা' (২য় বালাম) লিখে সমাপ্ত করলেন। শুধু তাই নয়, এই দোভাষী রীতিতে তিনি বাকি দুখানি কাব্যও রচনা ক'রে গরীবুল্লাহ্‌ প্রবর্তিত ভাষা-রীতিকে জনপ্রিয় করে তুললেন।

সৈয়দ হামযার তৃতীয় কাব্য 'জৈগুনের পুঁথি'। তিনি এটি লিখে সমাপ্ত করেন ১২০৪ সালে অর্থাৎ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। কবির উক্তি :

'ত্রিপদী করিয়া ছন্দ করিয়া তামাম বন্ধ
লেখা গেল ২৩শে আশ্বিনে।

বার শত চারি সালে জুমার নামাজ কালে
বাকি সোমবারের সাত দিনে ॥
( জৈগুনের পুঁথি )

কবির চতুর্থ ( ও শেষ ? ) কাব্য 'হাতেমতাঈ' রচিত হয় কবির উক্তি মতে ঃ

এক শ একুশ লিখে তার পিঠে শূন্য রাখে
সনের ঠিকানা পাবে তায় ।
বাঙ্গালা আখেরি সালে গরমীর বাহার কালে
পুঁথির তারিখ লেখা যায় ॥
( হাতেমতাঈ )

অর্থাৎ ১২১০ সালে ( ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ ) 'হাতেমতাঈ' কাব্য লিখে সমাপ্ত করেন সৈয়দ হামযা। বলা বাহুল্য, কবির উপরোক্ত চারিখানি কাব্য রচনায় তৎপর হওয়া ও সেগুলির রচনাকার্য সমাপ্ত করার পিছনে ছিল তাঁর নিশ্চিন্ত পরিবেশ। তিনি সুদীর্ঘ আঠার বৎসর অতিবাহিত করেন ভুরশুট পরগণার বসন্তপুর গ্রামের অবস্থাপন্ন মঈনুদ্দীন মোল্লার বাড়িতে। এখানে অবস্থান ক'রেই কবি তাঁর কাব্যগুলি রচনা করতে সমর্থ হন।

### ঃ মধুমালতীর কাব্য-কাহিনী ও রচনা বৈশিষ্ট্য ॥

'মধুমালতী' রোমান্টিক কাহিনী-কাব্য। তবে কাব্যখানি মৌলিক রচনা কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে। 'মধুমালতী' খুব সম্ভব হিন্দী বা ফারসী কাব্য অনুসরণে লিখিত হয়েছিল। এ-কাব্যে কবির নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিচয় থাকা বিচিত্র নয়। এ দেশে 'মধুমালতী'র কাহিনী বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। আমি পূর্বেই বলেছি যে মধু-মালতীর উপাখ্যান অবলম্বনে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবি কাব্য রচনা করেছেন। বাংলা দেশ গতানুগতিকতার দেশ ; তার ফলে একই ধরণের উপাখ্যান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে একাধিক কবি কাব্য প্রণয়ন করেছেন—আসলে এগুলোর গল্পাংশ মূলতঃ একই। এই

রকমেরই একটি জনপ্রিয় উপাখ্যান হলো 'মধুমালতী'। 'মধুমালতী'র কাহিনী নিম্নরূপ :

কিঙ্কর নগরে ছিলেন সূর্যভান নামক এক রাজা এবং কমলা সুন্দরী নামক এক রাণী। কুমার মনোহরের বয়স যখন মাত্র বার বৎসর তখন তিনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। অভিষেকের পর একদিন রাজা শুয়েছিলেন বাইরে। এই সময়ে নিদ্রিত মনোহরকে আকাশ পরীরা পালঙ্ক সমেত উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলো মহারস দেশে যেখানে রাজা বিক্রম ও রাণী রূপমঞ্জুরীর কন্যা রাজকুমারী মধুমালতী ঘুমিয়েছিলেন। পরীর দল রাজা মনোহরকে রাজকুমারী মধুমালতীর কাছে রেখে দিয়ে চলে যায়। উভয়ের ঘুম ভাঙলে তাঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে আঙটি ও পালঙ্ক বদল করে শয়ন করেন। তাঁরা দুজনে যখন গভীর ঘুমে অচেতন, সেই সময় পরীর দল মনোহরকে পুনরায় তাঁর দেশে কিঙ্কর নগরে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। ভোর বেলা মনোহর নিদ্রা থেকে জেগে উঠে পূর্ব রাত্রির প্রেম-বৃত্তান্ত স্মরণ করে উন্মত্ত হন। তারপর তিনি পিতামাতা ও রাজ্য ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে বেরুলেন রাজকন্যার সন্ধানে। অনেক পথ-প্রান্তর পেরিয়ে অবশেষে এক বালাখানায় প্রবেশ করে তিনি দেখতে পেলেন চিত্র সেনের কুমারী কন্যা প্রেমাকে। এক দৈত্যের হাতে বন্দী হয়েছিল প্রেমা। মনোহর দৈত্যকে হত্যা করে প্রেমাকে করলেন মুক্ত। প্রেমা মধুমালতীর বান্ধবী। প্রেমের সাহায্যেই মনোহর মধুমালতীর পুনর্মিলন ঘটলো। কিন্তু এদের সকলকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে রাণী রূপ মঞ্জুরী করলেন ভুল এবং প্রেমাকে করলেন তিরস্কার; আর মালতীকে মন্ত্রদ্বারা শুক পক্ষীতে পরিণত করলেন। পাখী উড়তে উড়তে গিয়ে উপস্থিত হলো মানিক নগরে, যেখানে সে ধরা পড়লো রাজা তারাচাঁদের হাতে। শুক আত্মপরিচয়ে নিজের বৃত্তান্ত বলল। রাজা তারাচাঁদ সব কথা বুঝতে পেরে তাকে নিয়ে চলে গেলেন রাজা বিক্রমের কাছে। রাণী রূপমঞ্জুরী মন্ত্রদ্বারা পুনরায় তাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন। তারাচাঁদের কাছে রাজা রাণী মনোহর-মধুমালতীর প্রেম-বৃত্তান্ত শুনলেন এবং মনোহরের সাথে কন্যার বিবাহ দিলেন। ইতিমধ্যে তারাচাঁদ প্রেমাসক্ত হলেন প্রেমার রূপ-যৌবনে। শেষে মধুমালতী ও মনোহরের সহায়তায় প্রেমা-তারাচাঁদের বিবাহ হলো। তাঁরা কিছুদিন পর স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

মূলকাহিনী হলো এই। কিন্তু সৈয়দ হামযার এই রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যানমূলক কাব্যে অবাস্তব কল্পনার ছায়াপাত হয়েছে। এই 'মধুমালতী' কাব্যের মূলে

আছে বিখ্যাত হিন্দী কবি মনঝনের 'মধুমালতী' কাব্য। কাজেই, মধ্য যুগের মুসলমান কবিগণ রোমান্টিক প্রেমকাহিনীমূলক কাব্য লেখার ব্যাপারে সব রকমের অস্বাভাবিক ঘটনা আমদানী ক'রেছেন; আর এভাবেই চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস আছে; পাঠকের চিত্তলোকে তার আবেদন ছিল গভীর। এ-কারণে, এ-কাব্যে পরী ও দৈত্যকে টেনে আনা হয়েছে; এবং কাহিনী এমনভাবে সংস্থাপিত যে, নায়ক-নায়িকারা পরীদের হাতে ক্রীড়নক। নায়ক-নায়িকারা নিজেদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেনি; বরং পরীবালাদের খেয়াল খুশী মাফিক মনোহর-মধুমালতীর মিলন, বিরহ এবং পুনর্মিলন ঘটেছে। কাব্যে মনোহর-মধুমালতীই নায়ক-নায়িকা। কিন্তু যাদের অদৃশ্য হাতের অঙ্গুলি সঙ্কেতে নায়ক-নায়িকার প্রণয়জনিত ইত্যাকার ঘটনা সংঘটিত হলো, তারা সব সময় অন্তরালেই রইল। অন্তরালে অবস্থান করলেও তাদের শক্তি ও ক্ষমতা যে অপ্রমেয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অথচ বাস্তব জীবন ও পরিবেশের সাথে ক্ষমতাশীল এই সব পরী কন্যার কোন সংশ্রব নেই। শুধু এইখানেই শেষ নয়; অতিপ্রাকৃত পরিবেশের সমাবেশ হয়েছে আরও অনেক ক্ষেত্রে। দৈত্য কর্তৃক চিত্রসেন কন্যা প্রেমার বন্দীবাস, মধুমালতীর শুকপক্ষীতে রূপান্তর প্রাপ্তি প্রভৃতি আজগুবি ঘটনা পাঠককে রূপকথার অতীন্দ্রিয় লোকেরই সন্ধান দেয়; কিন্তু বাস্তব জীবনের সুখদুঃখের পরিচয় এখানে অনুপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে, 'মধুমালতী' কাব্যের কাহিনীভাগ রূপ-কথার লক্ষণাক্রান্ত। এই ধরণের কাহিনীর প্রতি তদানীন্তন কালের পাঠক-সমাজের এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল ব'লে, সৈয়দ হামযা হিন্দী বা ফারসী উপাখ্যানকে খুব সম্ভব অবিকৃত রেখে মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলায় এ-কাব্য রচনা করেছেন।

ভাষার দিক থেকে তুলনা করলে দেখা যাবে, দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে 'মধুমালতী' কাব্যের ভাষার কোন সাদৃশ্য নেই বললেই চলে। (তবে দোভাষী পুঁথির কয়েকটি বিশেষ শব্দ যেমন, 'আসক', 'ছামান', 'লিয়া', 'মেওাজাত', 'মাঙ্গাইয়া' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন কবি সৈয়দ হামযা) সাদৃশ্য লক্ষণীয় হবে উপাখ্যানের প্রকৃতি ও উপাদানের ক্ষেত্রে। উপাখ্যান-নির্মাণে সাধারণভাবে দোভাষী পুঁথির মধ্যে যে স্বপ্ন-কল্পনা ও অবাস্তবতার ছাপ স্পষ্টই লক্ষ্যযোগ্য, সৈয়দ হামযার এই কাব্যখানির মধ্যেও তা বর্তমান। দোভাষী কাব্যের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে সাধারণতঃ দ্রুততার অভাব দেখা যায়; কিন্তু 'মধুমালতী' কাব্যের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একটা আশ্চর্য দ্রুততা রয়েছে। আর এই দ্রুততাই পাঠকের পাঠ-স্পৃহাকে বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া

এ-কাব্যের আর একটা বৈশিষ্ট্য, মুসলিম উপাখ্যান এ কাব্যের উপজীব্য নয়, এটি ধর্ম-সম্পৃক্ত সাহিত্যও নয়, শ্রোতাকে নিছক রস পরিবেশনে তৃপ্ত করাই এর প্রধান লক্ষ্য। এ কাব্য থেকে আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সৈয়দ হামযার সময়েও কাব্য গুণান্বিত সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সাধু ভাষারই' আশ্রয় গ্রহণ করা হতো এবং ধর্মীয় বিষয় ও মুসলিম উপাখ্যানগুলি "দোভাষী-বাংলায়" লেখা চলতো।[৩৯]

সাধুভাষায় রচিত বলেই শুধু নয়, নানা কারণে 'মধুমালতী' সৈয়দ হামযার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন: "কাব্যকলা ও কল্পনা-বিলাসে, ভাষা-সৌষ্ঠব ও প্রকাশ ভঙ্গিতে, কবির সৌন্দর্যবোধ ও সাবলীলভাবের অভিব্যক্তিতে এবং স্বাভাবিকতা ও প্রাঞ্জলতায় কাব্যখানি হামযার অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।"[৪০]

এইবার কবির রচনা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিই। কবি সৈয়দ হামযার 'মধুমালতী' কাব্যখানি আসলে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলায় লেখা—দোভাষী পুঁথির আওতায় এ কাব্যকে টানা যায় না। তাছাড়া, দেদার আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দ আমদানী ক'রে এ-কাব্য লেখার প্রয়াসও কবি করেন নি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে সহজেই এটি লক্ষ্য করা যাবে যে, দৌলত উজীর বাহরাম খান, সৈয়দ সুলতান, আলাওল, দৌলত কাজী, মুহম্মদ খান প্রমুখ কবি কাব্য-রচনার জন্য যে-ভাষা গ্রহণ করেছিলেন, সেটা হলো প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষা;—কবি সৈয়দ হামযা 'মধুমালতী'তে পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য ও রীতি অনুসরণেই অগ্রসর হয়েছেন। আলাওল ও অন্যান্য কবির কাব্যরচনায় পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বর্তমান, পক্ষান্তরে হামযার রচনায় হৃদয়াবেগটাই প্রবল।

দৌলত উজীর বাহারাম খান, আলাওল কিম্বা দৌলত কাজী মধ্যযুগের যে-কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবির কাব্যের নায়িকার রূপ-বর্ণনার সঙ্গে সৈয়দ হামযার মধু-মালতীর রূপ-বর্ণনার তুলনা করলে তাঁদের রচনা বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। আলাওল প্রমুখ কবি নায়িকার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তার দেহের প্রত্যেক প্রত্যঙ্গের পৃথক পৃথক বর্ণনা দিয়েছেন, আর সে বর্ণনা হয়েছে উপমা, উৎপ্রেক্ষা

৩৯ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: মুসলিম বাঙলা সাহিত্য, পৃ: ২৯৪-২৯৫।

৪০ পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯৪।

প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কারপূর্ণ। অথচ এই কবিদের বর্ণনায় নায়িকার পূর্ণাবয়ব চিত্র সব ক্ষেত্রে ফুটে উঠে নি। কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য থেকে একটা উদাহরণ দেই। 'পদ্মাবতীর' রূপ-বর্ণনায় আলাওল বলেছেন ঃ

পদ্মাবতীর-রূপ কি কহিব মহারাজ।
তুলনা দিবার নাহি ত্রিভুবন মাঝ ॥
আপাদ লম্বিত কেশ কস্তুরি সৌরভ।
মহা অন্ধকারময় দৃষ্টি পরাভব ॥
অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর।
শ্যামতা সৌষ্ঠব কেহ নহে সমসর ॥
ত্রিগুণ সঞ্চারে বেণী ত্রিভুবন মোহন।
এক গুণে ডংসিতে পারয় ত্রিভুবন ॥
বিরাজিত কুসুম-গুম্ফিত মুক্তাহার।
সজল জলদ মধ্যে তারকা সঞ্চার ॥
তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি।
বলাহক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনী ॥
ভাগ্যের উদয়-স্থলী ললাট সুন্দর।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ॥
বালক চন্দ্রিমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন।
মহান ললাট অতি ভাগ্যবিধি চিন ॥
কিমতে বলিব ভাল তুলনা মৃগাঙ্ক।
সকলঙ্ক চন্দ্রিমা ললাট নিষ্কলঙ্ক ॥
কামের কোদন্ড ভুরু অলঙ্ঘ্য সন্ধান।
যাহারে হানয় বালা লয় যে পরাণ ॥
ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুমশর ধনু ॥
ভুরু চাপ, গুণাঞ্জন বিশিখ কটাক্ষ।
ত্রিভুবন নাশিল করিয়া সেই লক্ষ্য ॥

প্রভারুণ বর্ণ আঁখি সুচারু নির্মল।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল ॥

ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে সৈয়দ হামযার রূপ বর্ণনা অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন। তাঁর ভাষা কাব্যে আবেগ সৃষ্টি করেছে ; অথচ এ-ভাষা একেবারে অলঙ্কারশূন্য নয়। প্রেমার যৌবন-পুষ্ট দেহের বর্ণনা দেবার ক্ষেত্রে হামযা যা বলেছেন, তাতে কবি কৃতির স্পষ্ট স্বাক্ষর বর্ত্তমান। 'মধুমালতী'তে হাম্যার ব্যবহৃত ভাষা মুঘল আমলের ঐতিহ্য-বাহী সাধু বাংলা ভাষা, অথচ এর সঙ্গে পূর্বসূরী সৈয়দ আলাওলের ব্যবহৃত ভাষার প্রভেদ অনেক। প্রেমার সৌন্দর্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে সৈয়দ হামযা বলেছেন :

সুবর্ণের ঘাটে দেখে শুয়ে একনারী।
নবীন যুবতী ধনী রূপের মুরারী ॥
পড়িছে মাথার কেশ সুন্দর বদনে।
ভ্রমর গুঞ্জরে তার অঙ্গের বসনে ॥
মনোহর ভাবে মনে না জানি কে হয়।
ইন্দ্রের কামিনী কিবা মুনির তনয় ॥

(পৃঃ ১১)

অথবা— — — — —

আরম্ভ করিল বেশ করিয়া যতন ॥
সাপিনী জিনিয়া কেশ মস্তক উপরে।
আঁচড়িয়া বান্ধে চূড়া সুবর্ণের ডোরে ॥
নব রঙ্গ আসিয়াছে রূপের জোয়ারে।
পরাইল পুনঃ তার বস্ত্র অলঙ্কার ॥
একে সে রূপের ছটা চমকে চিকুর।
রূপ বেশ বর্ণনা করিব কতদূর ॥

ইত্যাদি (পৃঃ ৬০)

আবার মধুমালতীর অঙ্গশোভা, বেশভূষা ও সৌন্দর্যের বিস্তৃত বর্ণনাও অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন কবি সৈয়দ হামযা। এ বর্ণনা পাঠকের মনে নায়িকার

দেহ-সৌষ্ঠবের একটা স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করে। কবি নায়িকা মধুমালতীকে অপরূপ সাজে সাজাতে গিয়ে তাঁকে তৎকাল প্রচলিত নানাবিধ অলঙ্কার ও বসন-ভূষণে সজ্জিত করেছেন। কবির বর্ণনায় তৎকাল-প্রচলিত অলঙ্কারের নাম জানা যায় সম্পূর্ণ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করলাম :

নারীগণ হরষিতে সোনার চিরুনী হাতে
বেড়িয়া বসিল মালতীরে।
সাপিনী জিনিয়া কেশ নানা ছন্দে করে বেশ
চূড়া বান্ধে মুকুতার ডোরে ॥
তাহাতে সুবর্ণ ঝাঁপা কর্ণেতে কনক চাঁপা
সিঁথা শোভে মানিকের পাটি।
নথ শোভে নাসিকায় অমূল্য রতন তায়
শোভা করে অতি পরিপাটী ॥
মস্তকে কেশের মূলে মুক্তা গাঁথা কত চলে
সারি সারি বিচিত্র বিনান।
রামগণ্ডি তার তলে ভঙ্গিমা করিয়া বলে
অলকা তিলক মহাবাণ ॥
মুখ তার পূর্ণ শশী তাহে প্রকাশিল আসি
বহুমূল্য মুকুতার ঝারা।
কেশঝারা কর্ণ মূলে তাহাতে মুকুতা দোলে
চাঁদকে বেড়িয়া যেন তারা ॥
কি কব কেশের ঘটা নয়নে কাজলে ফোঁটা
ভঙ্গিমা চাহনি মহাবাণ।
অপরূপ ভুরু জোড়া ধনুকেতে দিয়া চড়া
রসিকে বধিতে অনুমান ॥

সিঁতায় সিন্দুর আভা অধিক পাইল শোভা
তার পাশে চন্দনের ফোঁটা।
নির্মল নাসিকা খানি বদন দর্পন জিনি
বিজুলি চটকে তার ছটা ॥
ওষ্ঠ দুটি বৃক্ষফল দন্ত করে ঝল্মল্
যেন পাকা ডালিম্বের দানা।
একে ত নব যৌবন তাহে অতি সুগঠন
বর্ণ জিনিয়া কাঁচা সোনা ॥
গলে সরস্বতি হার লক্ষ টাকা মূল্য তার
গজমতি তার সঙ্গে দোলে।
পরিল লক্ষের শাড়ি কাঁচুলি বগল বেড়ি
চিকুর দেখিয়া পড়ে ভূমে
হাঁসুলি শেফালি আর মাথা বেড়ি সিঁতা তার
বাজু-বন্দ শোভে বাহু মাঝে।
বাহুটি মানিক জোড়া কঙ্কন দুহাতে বেড়া
আঙ্গুলে অঙ্গুরি ভাল সাজে ॥

ইত্যাদি

ভাবলে সত্যই আশ্চর্য বোধ হয়, যিনি দোভাষী বাংলা সাহিত্যের কবি ব'লে সাধারণতঃ পরিচিত, তিনি প্রসাদগুণ সম্পন্ন সাধু বাংলা ভাষার কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ফলতঃ সৈয়দ হামযা উভয় রীতিতে কাব্য রচনায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান কবি ; কাজেই অনেক সময় তিনি সাধারণ বর্ণনাকেও শিল্প-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন। তাঁর পূর্বসূরী ফকীর গরীবুল্লাহ্-র ন্যায় তাঁর রচনার মধ্যেও সংযমের নিদর্শন বর্তমান। একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটা বুঝবার চেষ্টা করা যাক্। সৈয়দ হামযা একস্থানে বলেছেন ঃ

সুবর্ণ পুঁথি পুত্র রাণী নিল কোলে ;
চন্দ্রের উদয় যেন গগন মণ্ডলে ॥

এখানে কবি রাজপুত্র মনোহরের রূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে উপরের উৎকলিত অংশটি লিপিবদ্ধ করেছেন। মনোহরের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি একাধিক অলঙ্কার প্রয়োগ করেন নি--তিনি অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন মাত্র একটি ; এবং সে হলো গগন মণ্ডলে উদিত চন্দ্রের সঙ্গে। সৈয়দ হামযা নবজাতক রাজকুমারের নশ্বর কান্তির বর্ণনায় অসাধারণ কোন বস্তু গ্রহণ করেন নাই, বরং সহজ, সরল ভাষা প্রয়োগে এবং তার মধ্যে মাত্র একটি উপমা প্রয়োগ করে বর্ণনায় অসাধারণত্ব আরোপ করতে সমর্থ হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ ধরণের বর্ণনা নিপুণতার পরিচয় কাব্য মধ্যে সর্বত্র সুলভ।

নর-নারীর রূপের বর্ণনায় সৈয়দ হামযা মধ্যযুগের কবিদের ন্যায় সাধারণতঃ যে-সব উপমাদি প্রয়োগ করেছেন সেগুলো বাংলা দেশের প্রকৃতি, সমাজ এবং পরিবেশ থেকেই গৃহীত। আর এইসব অলঙ্কার প্রয়োগে কবির ভাষা শ্লথ হয়নি, বরং সর্বক্ষেত্রে তা গতিশীল হয়েছে। আর এই ভাষা প্রয়োগে নর-নারীর চরিত্র বিশেষ ক'রে নারী-চরিত্র সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। কবি 'মধুমালতী'-কাব্যে নায়িকা ও প্রতি নায়িকাদের রূপ বর্ণনায় সাধারণতঃ যে-সব বস্তুকে অলঙ্কার হিসেবে গ্রহণ করেছেন সেগুলো নতুন কিছু নয়। খঞ্জন, কামান, চন্দ্র-সূর্য, তারকা, তীর-ধনুক, দর্পণ, বৃক্ষফল, ডালিমদানা, কাঁচাসোনা প্রভৃতি বস্তু বা উপকরণ সৈয়দ হামযার পূর্বসূরী ও ওস্তাদ ফকীর গরীবুল্লাহ্‌ও ব্যবহার করেছেন ; আর গরীবুল্লাহ্‌র পূর্বে সমগ্র মধ্য-যুগের সাহিত্যে মুসলমান কবিরা এগুলোই ব্যবহার করেছেন নানা বিচিত্র কল্পনার যোগান দিয়ে। কিন্তু এঁদের বাণী-বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে-মৌলিক পার্থক্য ছিল, সে বিষয়ে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। আমি আরও বলেছি যে সৈয়দ হামযা, গরীবুল্লাহ্‌র ভাব-শিষ্য। ভাবই শুধু নয়, তাঁর প্রবর্তিত ভাষাও গ্রহণ করেছিলেন তিনি। গরীবুল্লাহ্ মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষা নিয়ে কোন কাব্য লেখেন নি, তাঁর ভাষা মূলতঃ দোভাষী বাংলা ; কিন্তু নর-নারীর সৌন্দর্য্য বর্ণনার ক্ষেত্রে গরীবুল্লাহ্‌ও ব্যবহার করেছেন সাধু বাংলা ভাষা। 'মধুমালতী' কাব্যে সৈয়দ হামযা যেখানে রূপবতী নায়িকা মধুমালতী বা প্রেমার দৈহিক সৌন্দর্যের চিত্র আঁকতে গিয়েছেন, এবং কবির বাণী-বিন্যাসে কাব্যের নায়িকা বা উপনায়িকারা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য-প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে, তখন আমাদের স্বাভাবিকভাবেই ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র নারীরূপ বর্ণনার প্রসঙ্গ স্মরণ পথে পতিত হয়। কারণ, ঐ-সব ক্ষেত্রে গরীবুল্লাহ্ রমণীর

রূপ-মাধুর্য তুলে ধরবার জন্য উপজীব্য করেছিলেন বিশুদ্ধ সাধুভাষা, যদিও সমগ্র কাব্য লিখেছিলেন দোভাষী বাংলায়। সুধি-পাঠকের অবগতির জন্য সৈয়দ হামযারও পূর্বসূরী ও কাব্যগুরু ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র কাব্য থেকে অংশমাত্র উদ্ধৃত করছি। গরীবুল্লাহ্‌ 'ইউসুফ-জেলেখা' কাব্যে নায়িকা জেলেখার রূপ-বর্ণনা করেছেন :

ত্রিভঙ্গ নয়ন যেন খঞ্জনের আঁখি।
ভুবন ভুলিতে পারে সেই রূপ দেখি ॥
দুইখানা ঠোঁট যেন কমলের ফুল।
তাহার বদন যেন চন্দ্র সমতুল ॥
বত্রিশ দন্ত দেখি যেন মুক্তার হার।
বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী বর ॥
দুটি হাত দেখি যেন কুন্দিকার তুল।
আলতায় চিকন যেন দশটি আঙ্গুল ॥
মুখের বচন যেন অমৃতের ধার।
পিঠের লোটনে শোভা গজমতি হার ॥
সুবর্ণের ফুল যেন চুলের উপর।
দুটি ঠোঁট দেখি যেন অতি সে সুন্দর ॥
বুকের কাঁচুলি যেন করে ঝিকিমিকি।
চন্দ্র-সূর্য মেঘে যেন হয়ে যায় লুকি ॥
অতি ক্ষীণ মাজাখানি কে করে বাখানি।
চলন খঞ্জন তার দেখে ভুলে মুনি ॥
সোনার পালঙ্কে বসে পানগুয়া খায়।
সোনার ভ্রমরে যেন চারিদিকে চায় ॥

(ইউসুফ-জেলেখা, পৃঃ ১৭)

'মধুমালতী' কাব্যে নর-নারীর বেশী ভিড় নেই। নারী চরিত্রের মধ্যে মধুমালতী, কমলাসুন্দরী, প্রেমা, রূপমঞ্জুরী, মালিনী এবং পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সূর্যভান, বিক্রম, মনোহর, তারাচন্দ্র সমগ্র কাব্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই পরিমণ্ডল

সৃষ্টির ব্যাপারে আকাশপরী, শুকপাখী ও দৈত্যের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মাত্র অল্প কয়েকটি চরিত্রের সমবায়ে রচিত এই কাব্য কবি পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিয়েছেন। কি ভাষা, কি বর্ণনা-নৈপুণ্য, কি সৌন্দর্য সৃষ্টি, কি প্রাঞ্জলতা যে দিক দিয়েই বিচার করা যাক্ না কেন, মধুমালতী সৈয়দ হামযার একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য।

## ॥ মধুমালতী কাব্যে সমাজচিত্র ॥

'মধুমালতী' কাব্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কাব্যের কাহিনী মূলে যাঁরা অবস্থান করেছেন তাঁরা অর্থাৎ মধুমালতী, সূর্যসেন, বিক্রম, প্রেমা, কমলাসুন্দরী, রূপমঞ্জরী, মনোহর প্রভৃতি নরনারী বাংলাদেশের সাধারণ জনসমাজের প্রতিভূ নন, তাঁরা সবাই রাজবংশ সম্ভূত ও অভিজাত সমাজের মানুষ। রাজা বাদশাহ্, রাজপুত্র রাজকন্যাদের নিয়ে যে সমাজ, সে সমাজ বলতে কবি ইঙ্গিত করেছেন দেশ বা রাজ্য-শাসনের ব্যাপারে নির্বাচিত ব্যক্তি বা রাজকর্মচারীদের কবি-বর্ণিত দু'একটি অংশ উদ্ধৃত করলে আমার কথা সুস্পষ্ট হবে। যথা ঃ

ক. কমলা কহিল যদি এত বিবরণ।
সমাজ করিয়া তবে বসিল রাজন ॥
পাত্রমিত্র পণ্ডিত গণক ডাকাইয়া।
সবায় কহিল রাজা বিনয় করিয়া ॥
করহ উত্তম দিন দেখিয়া শাস্তরে।
রাজসিংহাসনে বসাইব মনুহরে ॥

খ. নানারূপে দান যে করিল মহারাজ।
পাত্রমিত্র ডাকাইয়া করিল সমাজ ॥
সভায় আছিল যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
সবারে কহিল রাজা করিতে সাজিত ॥
শুনহ পণ্ডিত সবে আমার বচন।
শাস্ত্র যে খুলিয়া সবে করহ গণণ ॥

গ. বাজীকর করে বাজী নানা পরীবন্দ।
ময়ূর পেখম নাচে দেখে লাগে ধন্দ॥
নৃত্যগীতে মোহ গেল রাজার সমাজ।
ধন্য ধন্য করিল আপনি মহারাজ॥
নানা দ্রব্য দান কৈল আপনি রাজন।
নৃত্যে চরিতার্থ হৈল পেয়ে নানা ধন॥
কত টাকা কত বস্ত্র কৈল পুরস্কার।
যে কেহ বসিয়া ছিল সমাজে রাজার॥

রাজ রাজড়ার কাহিনী নিয়ে 'মধুমালতী' কাব্য রচিত হলেও এতে সৈয়দ হামযার সমসাময়িক কালের বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয়ও বর্তমান রয়েছে।

তখনকার দিনে হিন্দু সমাজে পুত্র-কন্যার বিয়ে-সাদীর ব্যাপারে জ্যোতিষ বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডাকিয়ে এনে দিনক্ষণ সব ঠিকঠাক করা হতো। শুধু যে রাজা-বাদশাদের সমাজে এই রীতি চালু ছিল তা নয়, সমাজের উচ্চ নীচ সকল স্তরের নর-নারীর মধ্যে এই রেওয়াজ মেনে চলা হতো। যে কোন শুভ কাজে বিশেষ করে বিয়ে সাদির মত কোন অনুষ্ঠান সম্পাদন করার পূর্বে জ্যোতিষ বা গণক ডেকে তাঁদের উপদেশাদি গ্রহণ করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। কবি বলেছেন ঃ

জ্যোতিষ ডাকিয়া আনে করিতে লগন।
করিল উত্তম দিনে করিয়া গণন॥

অথবা

মনোহর বলে তবে বিবাহের লগ্ন কবে
কহ রাজা মোরে বুঝাইয়া।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডাকি লগনের পত্র লিখি
দিন ক্ষণ করলা বসিয়া॥
এত শুনি চিত্রসেন করিতে বিবাহ ক্ষণ
ডাকাইল পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।

আসিয়া পণ্ডিত যত  বিহিত বিধান মত
বিবাহের করিল লগন ॥
বিবাহের লগন করি  মনোহরে ত্বরা করি
তারাচন্দ্রে কহে সমাচার।

অতঃপর, বিবাহের লগ্ন ঠিক হলে বিবাহের পূর্বে কন্যাকে যে কি ভাবে ও কি পরিবেশে গোসল করান হতো, কবি তার চিত্র এঁকেছেন।

শুনিয়া দাসীর মুখে  মঞ্জুরী পরম সুখে
নবীন যুবতীগণে লিয়া।
মালতী কন্যার তরে  সুবর্ণ পিঁড়ির পরে
স্নান করাইল বসিয়া ॥
নানা হাস্য পরিহাসে  মালতীর আসে পাশে
রূপসী গাএন গান গায়।
যুবগণ কুতূহলী  কেহ দেয় করতালি
কেহ কেহ খঞ্জনী বাজায় ॥
লইয়া সুবর্ণ ঝারি  আনন্দে কৌতুক করি
কেহ কেহ দেয় জলধার।
নারীগণে আনন্দেতে  অতি সরু গামছাতে
বদন মোছন করে তার ॥
নাওয়াইয়া মালতীরে  দ্বিতীয় পিঁড়ির পরে
বসাইয়া মুছিয়া বদন।
দুইচারি সখি মিলে  সবে অতি কুতূহলে
কেহ তার বদলে বসন ॥

কবি-বর্ণিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী-সমাজের এই রীতিপদ্ধতি ও আচার-প্রণালী আধুনিক সমাজে বহু অঞ্চলে অদ্যাপি অনুসৃত হয়ে আসছে। মোট কথা, পুত্র-কন্যাদের বিবাহ উপলক্ষে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই আমোদ প্রমোদ করার

রীতি প্রচলিত ছিল। রাজপুত্র বা রাজকন্যার বিয়েতে রাজা যেমন প্রজাদের মধ্যে টাকা পয়সা, থালা, ঘটি, বাটি, গাড়ু, ঝারি এবং অলঙ্কারপত্র দান খয়রাত করতেন, তেমনি সাধারণ লোকের মধ্যে কারো অবস্থা একটু সচ্ছল হলে সে নিজের সাধ্যশক্তি অনুসারে ইষ্টমিত্র ও কুটুম্বদের দাওয়াত করতো। সৈয়দ হামযার 'মধুমালতী' কাব্যে আছে ঃ

ইষ্টমিত্র কুটুম্ব আইল নিজ-বাসে।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত ছিল তার দেশে॥
নানারঙ্গ বাদ্য বাজে প্রতি ঘরে ঘরে।
নৃত্য-গীত রাগ-রঙ্গ সবার দুয়ারে॥
নগরেতে দান কৈল যত প্রজাগণে।
লক্ষ টাকা দান কৈল আপনি রাজনে॥
থালা ঘটি, গাড়ু, ঝারি দিল কত শত।
বস্ত্র অলঙ্কার আদি দান কৈল কত॥

সমাজের সকল স্তরে বিবাহোৎসবে উপহার বা যৌতুকাদি দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। তবে অবস্থাবান ব্যক্তিগণ বর-কন্যাকে নানা মূল্যবান দ্রব্য যৌতুক দিতেন এই মূল্যবান দ্রব্যগুলো ঃ

সোনারূপা টাকা কড়ি হাতি ঘোড়া উট গাড়ি
নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার।

এই সব বস্ত্র অলঙ্কারাদি বর-কন্যাকে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তাদের সঙ্গে যেত দাসদাসী, চাকর-নফর, দুয়ারি, প্রহরি, ঘড়িয়াল, চৌকিদার, কোটাল প্রভৃতি।

সেকালে নবজাতকের নামকরণের বেলায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ডাক পড়তো, তাঁরা দিনক্ষণ সব ভালো ভাবে দেখে শুনে তবে কুলজি, কুষ্টি বা জন্মপত্র তৈরী করতেন। কবি বলেছেন ঃ

শুনহ পণ্ডিত সবে আমার বচন।
শাস্ত্র যে খুলিয়া সবে করহ গণন॥

উত্তম দেখিয়া রাখ কুমারের নাম
জন্ম পত্র লেখ যাতে সিদ্ধ হয় কাম ॥
শুনিয়া রাজার রাণী যতেক পণ্ডিত ।
শাস্ত্র খুলিয়া সবে দেখিল ত্বরিত ॥
পণ্ডিত সকলে তা গণন করিয়া ।
মনোহর রাখে নাম বিহিত বুঝিয়া ॥

বালক-বালিকাদের হাতে খড়ি দেবার সময় গুরু বা শিক্ষককে নানাবিধ ধনরত্ন দান করা হতো। কবির উক্তি :

গুরুকে সন্তুষ্ট কৈল দিয়া নানাধন ।

শুধু তাই নয়, অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকেও নানা দ্রব্য দান করার রীতি প্রচলিত ছিল । কাব্যে এ-সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে :

নানা দ্রব্য দান কৈল পণ্ডিত সভায় ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের মেয়েরা নানাধরণের অলঙ্কারাদি ব্যবহার করত। এই সব অলঙ্কারের মধ্যে অনেকগুলি বর্তমান শতাব্দীতেও সমাজে প্রচলিত রয়েছে। হামযার কাব্য পাঠে তদানীন্তন কালের অলঙ্কারাদির নাম জানা যাচ্ছে। যেমন, কেশমূলে মুক্তাগাঁথা বা স্বর্ণ ঝাঁপা, সিঁথাতে মানিক পাটি ; কানেতে কনক-চাঁপা, নাসিকায় নথ, কর্ণমূলে কেশঝারা, গলায় সরস্বতিহার বা গজমতিহার, পরনে লক্ষের শাড়ি, বুকে কাঁচুলি, বাহুমূলে বাজুবন্দ, দুই হাতে কঙ্কণ, আঙ্গুলে অঙ্গুরী, চরণে নূপুর। আর এই সব অলঙ্কারের সঙ্গে মেয়েদের নয়নে শোভা পেত কাজল-ফোঁটা এবং সিঁথায় সিন্দুরআভা তার পাশে চন্দন-ফোঁটা। মেয়েরা তৎকালে প্রসাধনের জন্য ব্যবহার করতো কুমকুম, কস্তুরী, চন্দন, আগর, গোলাপ অথবা আতর। এই সব সুগন্ধি অভিজাত বংশের মেয়েরা অঙ্গ-সজ্জার জন্য সাধারণতঃ ব্যবহার করলেও উচ্চ পদস্থ পুরুষদের মধ্যেও আতর, গোলাপ ইত্যাদি ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল। কারণ, কবি বলেছেন :

... ... ...

অঙ্গেতে ভূষিত কৈল কুমকুম কস্তুরী ॥

আগর চন্দন দিল গোলাপ আতর।
অঙ্গের সুগন্ধে তার মোহিত ভোমর ॥

অথবা— আগর চন্দন চুয়া কুমকুম কস্তুরী।
আতর গোলাপের বাসে মোহ কৈল পুরী ॥

তদানীন্তন বাংলা দেশে যে সব বাদ্য যন্ত্র বাজান হতো তার একটা ফিরিস্তি পাওয়া যাচ্ছে কবির কাব্যে। সৈয়দ হামযা 'মধুমালতী' কাব্যে উল্লেখ করেছেন :

তবলা তম্বুরা তুরী বেণু বাঁশী খঞ্জরী
রাগ বাজা সবার দুয়ারে ॥
ঢাক ঢোল কাড়া কাঁসী সারিঙ্গা ধুতুরা বাঁশী
মৃদঙ্গ মন্দিরা কত বাজে।

অথবা—

নানা রঙ্গে বাদ্য বাজে তবল দোকড়ি।
মধুর বাজনে নাচে কত ঘোড়া ঘুড়ি ॥
জয়ঢাক কাড়া কাঁসী ভেউর তরঙ্গ।
তাম্বুতা দোতারা বাজে মাদল মৃদঙ্গ ॥

অথবা—

দামাম দগরি কাড়া লাগিল বাজিতে।
শুনিতে আইল লোক কুমারে দেখিতে ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেকালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিকিকিনের জন্য টাকার সঙ্গে কড়ির প্রচলন ছিল। কবি বলেছেন :

(ক) ধন কড়ি নিল কত বিহিত বুঝিয়া। (পৃঃ ৩৪)

(খ) ধন কড়ি রাজ্যপাট যত অধিকার। (পৃঃ ৬৫)

তৎকালে ঘরের লোকজন মাত্রই স্থানান্তরে গমনের উদ্দেশ্যে চড়তেন 'দোলা ঘোড়া চৌদলে' অথবা 'ঘোড়া দোলা চোপালা'য়। ঘোড়ায় চড়ে একস্থানে থেকে অন্য স্থানে গমনাগমনের রেওয়াজ এখনও পল্লীবাংলায় সমানভাবে প্রচলিত আছে;

কিন্তু আধুনিক যান্ত্রিক-সভ্যতার প্রসারে আজকালকার দিনে মফঃস্বলের কোন শহর অঞ্চলেও ঘোড়ায় চড়ে গমনাগমনের ব্যবস্থা দেখা যায় না। কবি অপর একস্থানে বলেছেন ঃ

রথ গাড়ি ঘোড়া দোলা    চৌদল ও চৌপালা
সাজাইয়া দিল বহুতর।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দোলা, চৌদল, রথ ও চৌপালার প্রচলন থাকলেও আজকালকার দিনে তার অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না।

## । কবির অন্যান্য কাব্যালোচনা ॥

আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, একমাত্র 'মধুমালতী' ব্যতীত সৈয়দ হামযার অন্যান্য তিন খানি কাব্য মুসলমানী বাংলায় লেখা। তিন খানি কাব্যের মধ্যে ,আমীর হামযা' ( ২য় বালাম ) অন্যতম। এটি ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র লেখা 'আমীর হামযা'র ( ১ম বালাম ) অবশিষ্টাংশ।

আমীর হামযা ( রাঃ ) ছিলেন হযরত রসূলুল্লাহ্‌র ( দঃ ) চাচা। তিনি ওহোদের যুদ্ধে কুরায়েশদের হস্তে নিহত হন। আমীর হামযা মহাবীর ছিলেন। তাঁর বীরত্বের কাহিনী নিয়ে অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক গল্প উপকথা-প্রধান বহু কেতাব লিখেছেন ফারসী ও উরদূ সাহিত্যের কবিরা। বাংলা সাহিত্যে দোভাষী পুঁথির কবিদ্বয় এ-ধরনের কাল্পনিক কাহিনী মিশ্রিত করে 'আমীর হামযা' রচনা করেছেন। সৈয়দ হামযার লিখিত এই বৃহৎ আমীর হামযায় ( ২য় বালাম ) এই রকমের বিষয় বস্তুই প্রাধান্য পেয়েছে। মোটকথা, পুঁথির মূল বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক, কিন্তু তার মধ্যে আমীর হামযার দেশ বিজয় ও বীরত্বের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা ঐতিহাসিক নয়। কবি ইতিহাস-আশ্রিত বিষয়কে কাব্যের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করলেও তিনি কাব্যখানিতে ঐতিহাসিক-মর্যাদা সর্বত্রই ক্ষুণ্ণ করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মহাবীর হামযা একটি মাত্র যুদ্ধে ( ওহোদ ) অংশ গ্রহণ করেন এবং সেই যুদ্ধে তিনি শাহাদৎ বরণ করেন। পক্ষান্তরে, কবির বর্ণনা পড়লে বুঝা যায়, নায়ক হামযা সুদীর্ঘ আঠার বৎসর কাল যুদ্ধ করেন কোফাত শহরে দেও-দৈত্য-এর সঙ্গে। আমীর হামযার দৈত্যদলের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী লড়াইয়ের চিত্র অত্যন্ত বীররসপূর্ণ এবং

মেহেরনেগারের সঙ্গে তাঁর পূর্বরাগ প্রভৃতি প্রেম-কাহিনী বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত।[৪১]

ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র "আমীর হামযায়" (১ম বালাম) বর্ণিত হয়েছে আমীর হামযার জন্ম বৃত্তান্ত, আমীর হামযার নওসেরয়াঁর যুদ্ধ, আমীর হামযা কর্তৃক উম্মরমাদি ও তার চুয়াল্লিশ ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দান প্রভৃতি। এই সব ঘটনার মধ্য দিয়া যে পুঁথি-রচনা শুরু হ'য়েছে, তা কবি অসমাপ্ত রেখেছেন তাঞ্জার গড়ে আমীর হামযার সঙ্গে মেহেরনেগারের মিলন পর্যন্ত বর্ণনা ক'রে।

গরীবুল্লাহ্‌র এই অসমাপ্ত পুঁথি সমাপ্ত করবার জন্য দায়িত্বভার নেন সৈয়দ হামযা। দায়িত্ব নিয়ে তিনি 'আমীর হামযা'র দোসরা বালাম লেখেন। কবি মোট পঁয়ষট্টি অধ্যায়ে এই দোসরা বালাম শেষ করেছেন। গ্রন্থের এই অংশের সূচনা করা হয়েছে তাঞ্জার গড় থেকে বাদশাহ্‌ নওসেরওঁা ও জোসিফের পলায়নের বর্ণনা দিয়ে। তারপর আমীর হামযার দামেস্ক আগমন, আমীরের সঙ্গে মেহের আফজুনের বিবাহ, হেন্দার হাতে আমীরের শাহাদৎপ্রাপ্তি প্রভৃতি নানা ঘটনা উপস্থিত করে সৈয়দ হামযা এই বিরাট পুঁথি সমাপ্ত করেছেন। বেহেস্ত, দুনিয়া, আসমান ও পাতালপুরী, সমুদ্রের তলদেশব্যাপী বিস্তার, বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়পরাজয়, দেও-দানব, হুর-পরী, সি-মোরগের ও আদমখোরের (নরখাদক) দেশ, কোকাফ প্রভৃতি অলৌকিক দেশ ও রাজ্য, বাস্তব ও অতি বাস্তব রাজা-বাদশাহ্‌-রাজকন্যা ইত্যাদির বর্ণনা পুঁথিখানিকে মহাকাব্যোচিত মাহাত্ম্য দিয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহ, লড়াই ফসাদ বীরত্ব দিগ্বিজয়ের অদ্ভুত কাহিনী ইনিয়ে বিনিয়ে নানা ছন্দে রচনা করা হয়েছে। নায়কের ধীর উদাত্ত গুণ, অসাধারণ বীরত্ব, অসম সাহসিকতার পরিচয় পাঠক ও শ্রোতাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে।[৪২] মোটকথা, এ-কাব্যে অনেক কিছু আছে, এগুলির মধ্যে আমীর হামযার বীরত্বের ব্যাপারটি মুখ্য হলেও এর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য হলো, নায়ক কর্তৃক যুদ্ধ মারফত বহু অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষাদান এবং তৎকর্তৃক বহু নারীর আসঙ্গলিপ্সা। এ শুধু 'আমীর হামযা' কাব্যের বৈশিষ্ট্য নয়—এই জাতীয় অন্যান্য কাব্যের বৈশিষ্ট্যও বটে।

---

৪১ মোহাম্মদ গোলাম হোসেন: বাঙ্গালা দোভাষী পুঁথি। মাসিক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৫২৫।

৪২ ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ: বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য—১ম সংস্করণ, ১৯৫২. পৃঃ ৯৯।

'আমীর হামযা' কাব্যে নায়ক হামযা একাধিকবার বিবাহ করেছেন প্রথমে তিনি নওশেরয়াঁ-কন্যা মেহেরনেগারকে বিবাহ করেন। তাঁর এই বিবাহ নারীর আসঙ্গ-লিপ্সা পূর্ণ করে নি; এই জন্য আমীর হামযা আরো কয়েকজন নারীকে বিয়ে করেছেন। সবক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নারীর প্রতি এক দুর্দমনীয় কামনায় জর্জরিত হয়েছেন নায়ক আমীর হামযা। শেষে বিয়ে-সাদির মাধ্যমে চিত্ত-চাঞ্চল্য শান্ত হয়েছে। সৈয়দ হামযার এ-কাব্য রচনা করবার মূলে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের বীরত্বের কাহিনীর মধ্যে দিয়া যে-ধরণের ধর্ম-প্রচারের চেষ্টা রয়েছে, আমীর হামযার সবকিছুর মধ্যে যেমন বীরত্বের কাহিনী ছাপিয়ে উঠেছে, তেমনি ধর্ম প্রচার— বেদীন্ কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সবাইকে পরাস্ত ক'রে আল্লাহের দীনে দীক্ষা দেওয়ার ভাবটাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।[৪৩] আমীর হামযা এই হিসেবে হিন্দুদের পৌরাণিক সাহিত্য 'রামায়ণ-মহাভারত'-এর সমপর্যায়ভুক্ত; শুধু পার্থক্যের মধ্যে এইটুকু দেখা যায় যে, আমীর হামযার কাহিনীর মূলে যে পটভূমিকা রয়েছে সেটা হলো ইসলামের প্রাথমিক যুগের এক ঐতিহাসিক বীর-পুরুষ এবং তাঁকে কেন্দ্র করে কবি-মানস থেকে উৎপন্ন নানা অলীক ও কাল্পনিক ঘটনা। আশ্চর্যের বিষয়, ঘটনার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য সৈয়দ হামযা বহু নারী-চরিত্রের আমদানী ক'রে তাদের এক এক জনকে বীরত্বের প্রতিভূ হিসেবে এঁকেছেন। পুঁথিখানি নর-নারীর কোলাহলে পূর্ণ। তথাপি বলতে বাধা নেই যে, এ-সব কবিকল্পিত কাহিনীর সমাবেশে কাব্য-রচিত হওয়ায় তাতে তদানীন্তন সমাজ-মানসের ছাপ ক্ষীণ-সূত্র।

'আমীর হামযা' কাব্যে কবির চরিত্র-চিত্রণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু হয়নি। সমগ্র কাব্যে উম্মর-উম্মিয়ার চরিত্রটিতে যা কিছু বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। এই চরিত্র-সৃষ্টিতে কবি বীর-রসের সঙ্গে হাস্যরসের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে উম্মর-উম্মিয়ার চরিত্রের যে বিশেষ দিক (হাস্যরস) প্রতিফলিত, তাকে কবি বাণীরূপ দিয়েছেন :

এক মর্দ কাল রং উচা তের গজ।
ছের পরে বড়া তাজ যেমন গুম্বজ ॥

---

৪৩ ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯।

বসিয়াছে শিয়ালের নেজ ছের পর।
তান মানে চলে ফের যেন বাজীকর ॥
লাল কম্বলের জামা গায় আছে তার।
চামের জম্বিল গলে কাঠের তলোয়ার ॥
একটা কামান টুটা আছে তার হাতে।
গোটা কত তীর আছে ফল নাহি তাতে ॥
বাঁশের বন্দুক কান্ধে কাগজের ঢাল।
চারি তরফেতে তাকে দেখান খেয়াল ॥

উম্মরের এই বেশ এমনই অদ্ভুত যে, তা দেখে আমীর হামযার দরবারের সভাসদ ও পাত্র-মিত্রগণ হাস্যসম্বরণ করতে পারেন নি।

আমির মিলিত তার গলায় ধরিয়া।
দরবারে লইয়া গেল হাত পাকড়িয়া ॥
কুঞ্জর দেখিয়া তারে হাসিয়া বেহুঁস।
তানমান দেখিয়া হয়রাণ ফতেনুস ॥
তামাম ছরদার তার হয়রতে রহিল।
মুখেতে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল ॥
আপনা আপনি সবে কানাকানি করে।
এমন ছুরত কভু না দেখি নজরে ॥
আমীর বসান তারে তাজিম করিয়া।
বসিল হামযার কাছে উম্মর উম্মিয়া ॥

দোভাষী বাংলা সাহিত্যে উম্মর উম্মিয়ার ন্যায় অদ্ভুত ধরণের চরিত্র বহু দেখা যায়। উম্মর উম্মিয়া ঐতিহাসিক চরিত্র কি না বলা শক্ত, তবে কবি তাঁকে আমীর হামযার নিত্যসহচর ও দেহরক্ষী হিসেবে চিত্রিত করেছেন।[৪৪] তাঁর যুদ্ধের সাজ-সজ্জা অতি

৪৪ মোহাম্মদ গোলাম হোসেন: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৭।

অদ্ভুত ধরণের। তাতে মনে হয়, উম্মর উম্মিয়া কবি সৈয়দ হামযার কল্পনার সৃষ্টি। এ ছাড়া, আরও যে-সব চরিত্রের সাক্ষাৎ 'আমীর হামযা' (২য় বালাম) কাব্যে পাওয়া যায়, সেগুলোর অধিকাংশই অনৈতিহাসিক। যেমন: জেপিন, বক্তেক, সরকোবের, কারুন, বদিউজ্জামান, আলজুস, বোজরচের মেহের, হেন্দেলা, গাওলঙ্গি, বোরহানা, হরমুজ, এস্তেকতানুস, হোমুস বাদশা, জমসেদ বাদশা, কাজ বাদশা, আদিছ বাদশা, প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র। এগুলির কোনটিই রক্ত-মাংসের সৃষ্টি নয়—সবগুলিই টাইপ। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে এগুলির সৃষ্টি। সৈয়দ হামযা কাব্য মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা এত অধিক বার দিয়েছেন, এবং বর্ণনা প্রদানের খাতিরে এত অধিক সংখ্যক পুরুষ-চরিত্রের আমদানী করেছেন যে, তা তাদের জীবনের আবেগ অনুভূতি সৃষ্টির ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সবই গতানুগতিক এবং নীরস। বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আভিজাত্যহীন। তাঁর পূর্বসূরী ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দচয়ন-কৌশল (যুদ্ধের বর্ণনা ছাড়া) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গরীবুল্লাহ্‌ এই কাব্যের ১ম বালামে অনেক স্থলে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। মেহের-নেগারের সৌন্দর্য বর্ণনা এবং চিত্রকর বুড়ির চরিত্র-চিত্রণের প্রসঙ্গ এ স্থলে উল্লেখ-যোগ্য। গরীবুল্লাহ্‌ সর্বত্র না হলেও অনেকস্থলে কাব্য-শিল্পের পরিচয় দিতে পেরেছেন। তাই যথাযথ শব্দ প্রয়োগে উপরোক্ত নারী-চরিত্রদ্বয় সুন্দর ফুটেছে। পক্ষান্তরে, সৈয়দ হামযার তুলিতে চরিত্রগুলি ভাল ফোটেনি। উভয় কবির শব্দ চয়ন-নৈপুণ্য এবং চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে পার্থক্য লক্ষণীয়।

গরীবুল্লাহ্‌ মেহেরনেগারকে সুনিপুণ শব্দ-বন্ধনে একটি জীবন্ত নারীমূর্তি-রূপে সৃষ্টি করেছেন যখন কবি বলেন:

মাথায় চাচর কেশ          হুর পরি জিনে বেশ
মুখে শোভা চান্দের সমান।
চাহনি মোহন বাণ          দেখিলে হারায় প্রাণ
ভুরু দুটি যেমন কামান॥
গলায় সোনার হার          কাঙ্গনের শোভা তার
আগু পিছু শোভা করে ঝাপা।

হেন নথ নাক মাঝে গজমতি তাহে সাজে
ছেরে শোভা কনকের চাঁপা ॥
কপালে মানিক পাটি গাঁথিয়া বান্ধেন চুটি
যেন শোভা আকাশের তারা ।
তিলক কপাল পরে চন্দ্র যেন শোভা করে
বন্ধ-বান্ধে সোনা রূপার ডোরা ॥
পায়েতে নূপুর দিল আন্ধার উজালা হৈল
বেশ যেন জিনিয়া পুতলি ।
ছিরি তার উঠে ভালো আন্ধারেতে হৈল আলো
বিজলি সমান ঝিলিমিলি ॥

( আমীর হামযা—১ম বালাম )

পক্ষান্তরে, সৈয়দ হামযার মেহেরনেগার চরিত্র অপরিস্ফুট। কাব্যান্তর্গত নর-নারীর রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে ফকীর গরীবুল্লাহ্ যেমন বিশুদ্ধ সাধু ভাষা প্রয়োগ করেছেন এবং বিশেষ বিশেষ চরিত্র ফুটিয়ে তুলবার প্রয়োজনে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় শব্দ আমদানী করেছেন, সৈয়দ হামযার বেলায় তার কোন পরিচয় নাই। সৈয়দ হামযার মেহেরনেগার-এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

... ... ... ... ।

মেহেরনেগার বিবি যেন কাঁচা সোনা ॥
এমন ছুরত বিবি মেহেরনেগার ।
দুনিয়ার বিচে নাহি এর বরাবর ॥
হুর পরি যার রূপে সরমেন্দা হইবে ।
কেমনে আমির তারে ভুলিয়া রহিবে ॥

( আমীর হামযা—২য় বালাম )

হুরুম বাদশার ভগ্নীর রূপ-বর্ণনার ভাষাও বৈশিষ্ট্যবর্জিত। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা

যাবে যে, মেহেরনেগারের রূপ বর্ণনা এবং হরুম-বাদশার ভগ্নীর রূপ বর্ণনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কবি শাহাজাদীর রূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

হরুম বাদশার যে বহিন এক আছে।
হুর পরি সরমেন্দা হইবে তার কাছে ॥
এমন ছুরত নেই জাহানেতে আর।
বাপের কওলে সাদি না হয় তাহার ॥

( ঐ—২য় বালাম )

'আমীর হামযা' কাব্যখানি সমগ্রভাবে বিচার ক'রলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ আছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করছি—কাব্যবর্ণিত বিজেতা মুসলমানেরা যখন একদিকে 'ঠাঁই ঠাঁই মসজিদে পড়িছে নামাজ', এবং এ কারণে তদানীন্তন মুসলমানদের ধর্মবিস্তার-স্পৃহা লক্ষ্য করা যায়, তখন অন্যদিকে এও দেখা যায় যে, তদানীন্তন মুসলমান ও আমীর হামযার ইয়ার-বন্ধুগণ পেয়ালাবাজিতে মত্ত। কবির ভাষায় :

করেন পেয়ালা বাজি তামাম ইয়ার।
নাজ বাজা ঢাক ঢোল হাজারে হাজার ॥ ( পৃঃ ১৪৬ )

আর শুধু ইয়ার-বন্ধুগণ কেন, স্বয়ং আমিরকেই দেখা যায় তিনি পেয়ালা বাজিতে মত্ত।

তামাম ইয়ার লিয়া পাহালওয়ান আমির।
করেন পেয়ালা বাজি খোসাল খাতির ॥

( পৃঃ ১৪৯ )

অন্যত্র

আমির তাহার তরে রাখে নেওাজিয়া
করেন পেয়ালাবাজি খোসালে বসিয়া ॥ ( পৃঃ ২৪৬ )

অন্যত্র

কুফর ভাগিয়া গেল দেখিয়া আমির।
করেন পেয়ালাবাজি খোসাল খাতির ॥ ( পৃঃ ২৩২ )

'আমীর হামযা' (২য় বালাম ) কাব্যে কবির শব্দ-ব্যবহার অথবা উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কুচিত। সৈয়দ হামযা বিখ্যাত কবি

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। অথচ ভারতচন্দ্র যেখানে "একান্তভাবে শব্দ-কুশলী কবি, ছন্দের পারিপাট্যে, বাগ-বিন্যাসের চটকে ভারতচন্দ্রের কাব্য সেকালের শব্দ-শিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ"[৪৫] হিসেবে বর্তমান,—সেখানে মুসলমানী বাংলায় কাব্য রচনার বেলায় কবি সৈয়দ হামযার সাহিত্যিক দৈন্য সত্যই পীড়াদায়ক। বস্তুতপক্ষে, ভারতচন্দ্রের সঙ্গে ফকীর গরীবুল্লাহ্ অথবা সৈয়দ হামযার কোনই তুলনা চলে না, অথচ আশ্চর্যের বিষয় কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে সংস্কৃত, বাংলা, ফারসী ও হিন্দী এই চারটি ভাষার ভাণ্ডার থেকে ইচ্ছামত শব্দ চয়ন করেছেন।[৪৬]

কথা হচ্ছিল সৈয়দ হামযার রচিত 'আমীর হামযা' (২য় বালাম) কাব্যে ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার ও অলঙ্কার প্রয়োগ নিয়ে। কবি যত্রতত্র অনেক উপমা ব্যবহার করেছেন। কোন উপমাই জীবনের আবেগে স্ফূর্ত নয়। অত্যন্ত সাধারণ উপমাই কবি আমদানী করেছেন তাঁর এই কাব্যে।

আমীর হামযার (২য় বালাম) ন্যায় 'জৈগুনের পুঁথি' ও 'হাতেম তাঈ'-এর ভাষাও দোভাষী বাংলা। "জৈগুনের পুঁথি' সৈয়দ হামযার তৃতীয় কাব্য। কাব্যের নায়ক মোহাম্মদ হানিফা (ইবনুল হানাফিয়া) যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু কাব্যে ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নি।

এই পুঁথিখানির মধ্যে হযরত আলীর পুত্র মোহাম্মদ হানিফার কয়েকটি যুদ্ধ বিশেষ ক'রে এরেম দেশের বাদশাজাদী জৈগুনের সঙ্গে যুদ্ধের বর্ণনাই মুখ্য। আর এই যুদ্ধের মারফত হানিফার সঙ্গে জৈগুণের প্রণয় এবং বিবাহ পর্বের বর্ণনা দ্বারা কবি কাব্য সমাপ্ত করেছেন। তবে, এ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম-প্রচার। মোহাম্মদ হানিফাকে কেন্দ্র করেই সৈয়দ হামযা এ-কাব্যের কাহিনী নির্মাণ করেছেন। কাব্যের নায়ক মোহাম্মদ হানিফা এবং নায়িকারূপে গ্রহণ করা হয়েছে অমুসলমান বিবি জৈগুনকে। কবি এ-কাব্যে দেখিয়েছেন যে, নায়ক হানিফা যুদ্ধ করে বহু অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষা দান করেছেন। কবি কাব্যের কাহিনীভাগে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে

---

৪৫ ডঃ সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৪৮, পৃঃ ৮৪০।

৪৬ মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত সে আরবী পারশী হিন্দুস্থানী॥

২৪৫৫

হানিফার পিতা আলীরও প্রসঙ্গ টেনেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, স্বয়ং আলীও ইসলাম প্রচার করেছেন তলোয়ারের জোরে, ইসলামের ঔদার্য-গুণে নয়। এর ফলে, একদিকে যেমন অপর ধর্মের প্রতি ইসলামের বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে ইসলামের অন্তঃসারশূন্যতা ব্যক্ত হয়েছে।[৪৭]

(ক) হানিফা কহেন যদি আনিলে ঈমান।
কালেমা পড়িয়া তবে হও মুসলমান॥
দেলে মুখে একিদায় ঈমান আনিয়া।
মুসলমান হৈল বিবি কালেমা পড়িয়া॥

(পৃঃ ২৪)

(খ) কহেন হযরত আলী শুন পাহালওয়ান।
আল্লাতালা রাখে তেরা সাবেক ঈমান॥
আল্লাকে ঈমান আন একিদা করিয়া।
নবীর কালেমা পড় মন লাগাইয়া॥
কালেমা নামাজ রোজা দীনদারী কাম।
এমলাক কহেন মুঝে কর মুসলমান॥
একচিত্তে একিদাতে আনিব ঈমান।
শুনিয়া হযরত আলী খোসাল খাতির।
আপনি পড়ায় তারে কালেমা নবীর॥

(পৃঃ ১১৯)

(গ) উম্মর উম্মিয়া তারে লিলেক বান্ধিয়া।
হযরতের আগে দিল দাখেল করিয়া॥

---

পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

(ভারত চন্দ্র: অন্নদামঙ্গল কাব্য)

৪৭ ডঃ আনিসুজ্জামান: সৈয়দ হামযা ও তাঁর কাব্য। সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা ১৩৬৫, পৃঃ ১১৭।

আলী কহে আন তুমি আল্লা পর ঈমান।
নবীর কালেমা পড়ে হও মুসলমান॥
নহেত জেন্দেগী তুমি বুঝিও আখের।
উড়াইয়া দিব শির মারিয়া শমশের॥

(পৃঃ ১২২)

(ঘ) হযরত কহেন তারে আইস তুমি দীন পরে
মুখে কহ কালেমা নবীর॥
যদি নাহি বাত রাখ হেম্মত করিয়া থাক
মারা যাবে হইয়া খারাব।
সেতাবি জানের ডরে কালেমা কবুল করে
মুসলমান হইল গোরাব॥

আর উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না।

এ-কাব্যে যে-প্রধান নারী-চরিত্রের সন্ধান পাই তার ভূমিকা সমগ্র কাব্যখানি জুড়েই বিদ্যমান। জৈগুন এরেমের বাদশাজাদী। তাঁকে এক অসাধারণ বীর্যবতী রমণী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এ-কাব্যে পুরুষচরিত্রগুলির মধ্যে মোহাম্মদ হানিফা এবং হযরত আলী মহাবীররূপে অঙ্কিত; কিন্তু জৈগুনের বীরত্ব তাদের উভয়ের বীরত্ব এবং শক্তিমত্তা অপেক্ষা বেশী প্রকাশ পেয়েছে। কবি কাব্য-খানির যে-কাহিনী নির্মাণ করেছেন, তাতে এই প্রয়াসই মুখ্য যে, মোহাম্মদ হানিফা অমুসলমান লোকজনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এবং তাদের পরাস্ত ক'রে ইসলাম ধর্মে দীক্ষাদান করেছেন। কিন্তু কাহিনী-বিন্যাসে অপরিহার্য হয়েছে বিবি জৈগুনের ভূমিকা; এবং দেখা যাচ্ছে যে, হানিফা যত লোক-লস্কর ও 'পাহালওয়ান'কে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন তার অধিকাংশ বিবি জৈগুনের বীরত্ব এবং কৃতিত্বের জন্যে। বিবি জৈগুনের বীরত্ব এবং যুদ্ধ-কৌশল ব্যতীত হানিফার পক্ষে ইসলাম প্রচারের কাজে সাফল্যলাভ করা সম্ভবপর হতো না, জৈগুনের ভূমিকা গ্রহণ থেকে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এরেমের বাদশাজাদী জৈগুন এবং আরব-ইরাণের কাহিনী বর্ণনায় যে সামাজিক পরিবেশ অঙ্কিত, তা নিতান্তই বাংলাদেশের। বাংলা দেশের সামাজিক পরিবেশ কবির কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এ-ছাড়া এ-কাব্যে অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নেই। নায়ক-নায়িকার পরিচয় ও রূপ-বর্ণনায়, উৎসবাদি ও সামাজিক রীতির বর্ণনায় দেশীয় পরিবেশ সুস্পষ্ট হয়েছে। 'হাতেম তাঈ' ছিলেন প্রাক্-ইসলাম যুগের এক কবি

ও বিশিষ্ট যোদ্ধা। তাঁর অতিথিসেবা ও পরোপকার সম্পর্কিত কাহিনী নিয়ে ফারসী ভাষায় লেখা হয়েছিল 'কিস্‌সা-ই-হাতেম তাঈ'। তুর্কী ভাষাতেও 'দাস্তানে হাতেম তাঈ' নামীয় কাব্য আছে। সৈয়দ হামযার 'হাতেম তাঈ' উরদূ কাব্য 'আরায়েশ মাহ্‌ফেল'-এর বঙ্গানুবাদ। হাসনাবানু নামক এক সওদাগরজাদীর রূপমুগ্ধ হওয়ায় মনীর স্বামী উন্মত্ত হয়। মনীর স্বামীর ইচ্ছাপূরণের জন্য হাসনাবানুর সাতটি সওয়াল জবাবের সন্ধানে হাতিম তাইয়ের অভিযান এ-কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। হাতিমের অভিযান বর্ণনায় কবি যে-সব অলৌকিক বিষয়বস্তু ও ঘটনার অবতারণা করেছেন, তাতে দেখা যায় যে কবি বাস্তবতাকে কাব্যে স্থাপন করতে পারেন নি। ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই অবাস্তব ও কাল্পনিক ; পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হবে যে, কবি যেন 'Folktale'-এর কাহিনী শুনাচ্ছেন। কিন্তু সমগ্র কাহিনী জুড়ে নায়ক হাতিমের আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ কর্ম-তৎপরতার বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে।

'হাতেমতাঈ' কাব্যে কবির বর্ণনা স্থূল ও গতানুগতিক। পুরুষচরিত্রগুলি নির্মাণে প্রণয়াবেগের আতিশয্য লক্ষণীয়। এই আবেগ নারী চরিত্রে অনুপস্থিত। চরিত্রগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিত্বহীন ; আঠার শতকের দোভাষী পুঁথির কবি সৈয়দ হামযা কোন কোন ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারলেও চরিত্র-সৃষ্টিতে মুন্সীয়ানা প্রদর্শণে ব্যর্থ হ'য়েছেন। 'হাতেমতাঈ'-এর চরিত্রে আদর্শবাদিতার সমাবেশ ; সমগ্র কিস্‌সার একমাত্র নায়ক হাতেমতাঈ। পরোপকারের মধ্য দিয়েই যে মানুষের মনুষ্যত্ব সপ্রমানিত হয়, এই চরিত্র মারফত কবি তাই প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন ; কিন্তু হাতেমের ঔদার্য ও মনুষ্যত্বমহিমা প্রকটিত ক'রতে সৈয়দ হামযা আমদানী করেছেন অবাস্তব ঘটনা ; আর এ-কারণেই এই নায়ক চরিত্রটি হয়েছে অতিমানবের লক্ষণাক্রান্ত। তাছাড়া মানুষে-পরীতে প্রেম অথবা মানুষে-দৈত্যে যুদ্ধবি-গ্রহের বর্ণনায় কল্পনার নির্বাধ উল্লাস এ-জাতীয় কাহিনীর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণ সাধারণ-ভাবে রাষ্ট্রনীতি থেকে দূরে অবস্থান করতেন। গ্রাম-কেন্দ্রিক জীবনচর্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনের উত্থান পতনের প্রভাব পড়ত না।[৪৮] কাজেই তাদের নির্ভর ক'রতে হতো কল্পনার উপর। বর্তমান কবিও তাই করেছেন।

৪৮ ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত : প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ণ, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃঃ ১৪১।

পূর্বেই বলেছি, কবি উরদূ কাব্য 'আরায়েশ মাহ্‌ফেল'-এর অনুসরণে এ কাব্য রচনা করেছেন ; কারণ তিনি প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন ঃ

"হীন হামযা কহে কেতাব দেখিয়া"

কবি উরদূ কেতাব দেখিয়া এটি রচনা করলেও এ-তে কবির মৌল রচনা সংযোজিত হয়েছে। 'হাতেমতাঈ' কাব্যের স্থানে স্থানে কবি-প্রতিভার নিদর্শন বর্তমান ; সেখানে তাঁর ভাষা উপমা-উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ অলঙ্কার প্রয়োগে সুন্দর। নমুনা উদ্ধৃত করি ঃ

(ক) আচানক এক পরী, আঁখিতে কামান জুরী,
মেরা আগে হইল হাজির।
দাঁড়াইয়া সম্মুখে, মারিল আমার বুকে,
চাহনি নয়ন-বাণ তীর॥
(খ) যেমন কাশির ঘাট, তেমন লোকের হাট।

ফকীর গরীবুল্লাহ্‌ ও সৈয়দ হামযর দোভাষী পুঁথিগুলির মূল্য প্রধানতঃ ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য। সাহিত্য-মূল্যের জন্য পাঠক-পাঠিকার মনে কোন কৌতূহলের উদ্রেক না হলেও ঐতিহাসিক মূল্যায়নের জন্য দোভাষী পুঁথিকারদের অবদানকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

## ॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

অমৃতসরী, উবায়দুল্লাহ্‌ বিসমিল : সওয়ানে উমরি হযরত আলী, ২য় সংস্করণ, হিজরী ১৩১৭।

গুপ্ত, ডক্টর ক্ষেত্র : প্রাচীন কাব্যে সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন ১ম সংস্করণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা।

দীন মুহম্মদ, ডক্টর কাজী: বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য। পাকিস্তান পাবলিকেশন্স। ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৫।

শরীফ, আহমদ: পুঁথি পরিচিতি, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

ঐ সম্পাদিত: মধুমালতী, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ ১৩৬৬।

সেন, ডক্টর সুকুমার: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা ২য় সংস্করণ ১৯৭৮।

ঐ : ইসলামি বাংলা সাহিত্য, বর্ধমান সাহিত্য সভা, বর্ধমান, ১৩১৮ বাং।

হক্, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল: মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৭।

হাই, মুহম্মদ আবদুল ও সৈয়দ আলী আহসান: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৬।

হাই, মুহম্মদ আবদুল: ভাষা ও সাহিত্য, ঢাকা, ১৩৬৬।

হামযা, সৈয়দ: সোনাভান, সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬।

Blumhardt, J. F.: Catalogue of the Bengali & Assamese Mss. in the library of the Indian office, Oxford University Press, 1924.

Bibliotheca Indica ed: পদ্মাবতী, canto XXIII.

Degoeje, M. J. ed.: At Tabari, II Series II, 1883-85.

Gibb & Kramers ed.: Shorter Encyclopaedia of Islam, 1953,

Long, J.: A Descriptive Catalogue of Bengali Works. Calcutta, 1855.

**সাময়িক পত্রিকা**

আল্ ইসলাম: কলিকাতা, ১৩২৩ বাং, ২য় বর্ষ, পৌষ-মাঘ।

দিলরুবা: ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ বাং।

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা: ঢাকা, ৩য় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৩৬৬ বাং।

মোহাম্মদী: ঢাকা, কার্তিক, ১৩৬১ বাং।

সাহিত্য পত্রিকা: বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শীত সংখ্যা ১৩৬৪-৬৫।

Catalogue of Persian Mss in the Behar Library, 1 No. 395.

# বাঙলা 'সমালোচনা'র বিকাশে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র ভূমিকা

শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক দেশেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও অনুশীলনে সাময়িক পত্র-পত্রিকা একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আস্‌ছে। সংবাদ হিসেবে সাহিত্যের সাময়িক পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে সাময়িক পত্র একদিকে সাহিত্যের 'জনযাত্রার পথ-চিহ্ন' অঙ্কিত করে দেয়, একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া গড়ে তুলে মানুষের সাহিত্য রস-পিপাসা জাগ্রত করে, মানুষকে বর্তমানের প্রতি সজাগ রাখে। আর এক দিকে যাকে বলে চল্‌তি সাহিত্য—যা অগণিত পুস্তকের আকারে অথবা পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্রোতের আকারে বয়ে যাচ্ছে, সে সব "সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের পরিচয় তথ্য ও তত্ত্বের যোগসূত্রে" গেঁথে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করে। এতে করে ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জনসাধারণের পক্ষে অবহিত থাকা সম্ভব হয়। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত সাহিত্য-সাধনার বিভিন্ন সংবাদ ও পুস্তক সমালোচনা থেকে একটা বিশেষ কালের সাহিত্যের উৎপত্তি ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমরা জ্ঞান-লাভ করতে পারি। শুধু তাই নয় বহু বিস্মৃত, অখ্যাত, অজ্ঞাত লেখকের যুগব্যাপী সাধনার নিষ্ফল প্রয়াস ও সফল প্রযত্ন সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। সাহিত্যের অমরাবতীতে যাঁদের স্থান জোটে নি, সেই ভাগ্যহীন ও স্বল্পজীবী সাহিত্য-সাধকরা সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে অবস্থান করেন। তাঁদের সম্পর্কে আমাদের কৌতুহল সৃষ্টি করে এ সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলো। তাই পাঠক-সাধারণ ও সাহিত্যিকদের মধ্যে সংযোগসাধন তথা সাহিত্যের প্রচার সাধনে সাময়িক পত্রের ভূমিকা খুবই কল্যাণকর ও গুরুত্বপূর্ণ। দেশে সাহিত্যিক আন্দোলন ও রুচি গড়ে তুলতে সাময়িক পত্রের জুড়ি অল্পই আছে। "সাহিত্যিক সংবাদ জনসাধারণের গোচর করিয়া সাংবাদিকগণ কেবল সাহিত্যের পথ নহে, সাহিত্যের পাথেয় বিষয়েও প্রভূত সাহায্য করিতে পারেন—তাহাতে সাহিত্য সেবা দ্বারা জীবিকা সংগ্রহের সুবিধা হইয়া থাকে এবং তাহা

সাহিত্যের অল্প উপকার নহে।"[১] সাংবাদিকের কাছে কেউ জটিল বিশ্লেষণ বা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বিচার প্রত্যাশা করে না, এটা ঠিক। কিন্তু সাংবাদিক পাঠক-সাধারণকে সম-সাময়িক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য-সরবরাহ করে, জাতীয় মানসের সাহিত্যিক উৎকণ্ঠা জাগ্রত রাখতে পারেন; সমকালীন সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের স্বরূপ সম্বন্ধে দেশবাসীকে সজ্ঞান রেখে দেশব্যাপী একটা সুস্থ সাহিত্য-বোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। তাছাড়া মানুষের কৌতূহল বৃত্তিকে জাগিয়ে রেখে জাতির জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করতে সাময়িক পত্রের ভূমিকার তো তুলনাই হয় না।

সাময়িক পত্রের এ ভূমিকা সম্পর্কে আমরা যে খুব সচেতন নই, এটা স্বীকার করতেই হয়। এ চেতনার অভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি যথেষ্ট। আমাদের দেশে বলিষ্ঠ কোন সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে উঠছে না এ কারণেই। উপযুক্ত পরিচালন ও আদর্শ নিষ্ঠার অভাবে আমাদের সাময়িক পত্রগুলো যথাযোগ্য দায়িত্ব পালনে সমর্থ হচ্ছে না। আমাদের জাতীয় জীবনে মনস্বিতা, দূরদৃষ্টি, সততার অভাব সার্বিক—তাই আমাদের রাজনীতি-প্রচেষ্টার ন্যায় সাহিত্য-প্রচেষ্টাও সংকীর্ণ খাতে প্রবাহিত। আমাদের সে দৈন্যের কথা উল্লেখ করে মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন: "আমাদের এই সাহিত্য-সহজিয়ার দেশে সকলেই নিজের নিজের অথরিটি– আত্মপ্রচার ও Mutual Admiration ই এরূপ সাহিত্য-সমালোচনার অভিপ্রায়। সংবাদ পত্রে যাহা কিছু সাহিত্যিক সংবাদ বাহির হয়, তাহার অধিকাংশ এই জাতীয় আর একটি বড় কাজ হইয়াছে—প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা; এই সকল রচনা অপাঠ্য, ......। যে ব্যক্তি ইহা লিখিয়া থাকেন তাঁহার একমাত্র যোগ্যতা—তিনি বুকনি-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন– লাগসই বচন-রচনে তিনি বিশেষ পটু।"[২] শুধু এই নয়, আমাদের সাময়িক পত্রাদিতে সাহিত্য-প্রসঙ্গ কম থাকে এবং যা থাকে তা প্রায়শঃই লঘু ও দায়িত্বহীন। বিদেশী সাহিত্যের সংবাদও সুন্দররূপে সঙ্কলিত হয় না। আমাদের সাময়িক পত্রগুলোর

---

১ মোহিতলাল মজুমদার: সাহিত্য বিচার (২য় সংস্করণ) "সংবাদপত্র ও সাহিত্য" প্রবন্ধ পৃঃ ২১৫।

২ মোহিতলাল মজুমদার: ঐ ঐ পৃঃ ২১৭।

মধ্যে যে গুলো মূলতঃ বার্তাজীবী সেগুলোতে সাহিত্যরস-পরিবেশনের তেমন উন্নত প্রচেষ্টা দেখা যায় না। জাতির বুদ্ধিকে সজাগ এবং চিত্তকে সজীব রাখার ব্যাপারে অন্যদেশে সাময়িক পত্রের ভূমিকা খুব ফলপ্রসূ হলেও, আমাদের দেশে যে তা ততটা হতে পারে নি, তার কারণ সাময়িক পত্রের যে বৈশিষ্ট্য বা character থাকা প্রয়োজন তা প্রায় কোথাও লক্ষিত হয় না।

বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস সম্পর্কে এ সত্য সাধারণ হলেও, অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। এ ব্যতিক্রমই সেই গুটি কয়েক পত্রকে সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। বাঙলা সাহিত্যের প্রসার ও পরিপুষ্টিতে, জাতির রসচেতনা জাগ্রত করতে, সাহিত্যিক ও পাঠকদের নৈকট্য বিধানে, উন্নত রুচিবোধ ও সাহিত্য-পিপাসা সৃষ্টিতে, রসজ্ঞান জন্মাতে—তথা সাহিত্যিক আবহাওয়া সৃষ্টিতে এ সব পত্রিকার অবদান যথেষ্ট। যে নিষ্ঠা ও আদর্শবোধের অভাবে আজ অধিকাংশ সাময়িক পত্র যথাযোগ্য দায়িত্ব পালনে অসমর্থ, এককালে সে-নিষ্ঠা ও আদর্শ-বোধ নিয়েই দেখা দিয়েছিলেন সেদিনের বেশ কয়েকটি সাময়িক-পত্রের সম্পাদক ও পরিচালকগণ। এঁরা যে দায়িত্ববোধ, যে আদর্শনিষ্ঠা, যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবোধ নিয়ে পত্র-পত্রিকা সম্পাদনে অগ্রসর হয়েছিলেন, আজকের দিনে তা দুর্লভ। তাই তাঁদের প্রচারিত পত্র সেদিন সাহিত্যে সঞ্জীবনীর কাজ করেছিল। এমনি একটি সাময়িক পত্র ছিল—'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'। এ পত্রিকাটি ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে মাসিক পত্র রূপে প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে নানা কারণে। পত্রিকাটি প্রকাশনার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। ১৮৫১ সালে কলিকাতায় ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি (Vernacular Literature Society) বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ নামে সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা-বাহুল্য এর পেছনে সরকারী উদ্যোগ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হজসন প্র্যাট, সীটন কার, পাদরি লঙ্ এবং রবিন্‌সন প্রমুখ মনীষীরা এ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল—"to publish translations of such works as are not included in the design of the Tract of Christian knowledge Societies on the one hand, or of the School Book and Asiatic Societies on the other and likewise to provide a sound and useful

Vernacular Domestic Literature for Bengal"[৩] খ্রীষ্টীয় জ্ঞান-প্রচার সমিতির পরিকল্পিত পথকে যেমন এঁরা পরিহার করলেন, তেমনি স্কুলবুক সোসাইটি বা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থ প্রকাশন পথও এঁরা মাড়ালেন না। পরন্তু দেশী ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য সাহিত্য রচনায় ব্রতী হলেন বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজ

এই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যেই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে (বাঙ্‌লা ১২৫৮ সালের কার্ত্তিক মাসে) 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকা প্রকাশের জন্যে সমিতির মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল আশী টাকা। পত্রিকাটি বিলাতী পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শে প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে বাঙ্‌লা সাময়িক পত্রের ইতিহাস লেখক ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায়, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে (কার্ত্তিক ১২৫৮) বিলাতী পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। বাংলায় প্রকৃতপক্ষে ইহাই "প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা।" পত্রিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র ছিল। পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্যব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় ইহার কলেবর পূর্ণ হইত।— ইহার পুস্তক সমালোচনার ও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল; এগুলি সম্পাদকের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।"[৪] পত্রিকাটি যে বিশেষ উঁচু মানের ছিল, এবং কিছুটা লোকপ্রিয় হয়েছিল, তা জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ শৈশবের স্মৃতি বর্ণন করতে গিয়ে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' সম্পর্কে যা বলেছেন তাতেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজ দাদার

৩ J. Long : Long's Returns (1859) pp. LIV-LV

৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাময়িক-পত্র (১ম খণ্ড) পৃ: ১২৩।

আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

"এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন। একদিকে বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান পুরাতত্ত্ব, অন্যদিকে প্রচুর গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণ কাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভরতি করা হয়। সর্ব সাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না।"[৫] এ কাগজটির প্রসঙ্গে তিনি বিলাতের চেম্বার্স জার্ণাল, কাস্‌লস্ ম্যাগাজিন, ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতির কথা স্মরণ করেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয়না, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' আমাদের কিশোর কবির মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। বস্তুতঃ বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পূর্বে এমন উচ্চমানের মাসিক পত্রিকা আর প্রকাশিত হয় নি। পত্রিকার এ উন্নতমানের জন্যে কৃতিত্ব রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়েরই বটে। মিত্র মহাশয়ের মত এমন রসজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি তখন কমই ছিলেন।

'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' প্রথম দিকে কিছুটা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হলেও, পরে তা সম্ভব হয় নি। পত্রিকাটি কয়েকটি পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। পর্বগুলোর প্রকাশ কাল থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নি। বিভিন্ন পর্বগুলোর প্রকাশকাল নিম্নরূপ:

প্রথম পর্ব: ১৭৭৩ শক, কার্ত্তিক—১৭৭৪ শক, আশ্বিন। (খ্রীঃ ১৮৫১-১৮৫২)
দ্বিতীয় পর্ব: ১৭৭৪ শক, পৌষ—১৭৬৫ শক, অগ্রহায়ণ। (খ্রীঃ ১৮৫২-১৮৫৩)
তৃতীয় পর্ব: ১৭৭৫ শক, চৈত্র—১৭৭৬ শক, ফাল্গুণ। (খ্রীঃ ১৮৫৩-১৮৫৪)
চতুর্থ পর্ব: ১৭৭৯ শক, বৈশাখ—চৈত্র। (খ্রীঃ ১৮৫৭)
পঞ্চম পর্ব: ১৭৮০ শক, ,, ,,। (খ্রীঃ ১৮৫৮)
ষষ্ঠ পর্ব: ১৭৮১ শক, ,, ,,। (খ্রীঃ ১৮৫৯)
সপ্তম পর্ব: ১৭৮৩ শক, বৈশাখ—অগ্রহায়ণ। (খ্রীঃ ১৮৬১)

---

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনস্মৃতি। রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃঃ ৩৩২।

পত্রিকার প্রথম ছয় পর্বের সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্র লাল মিত্র। রাজেন্দ্র লালের পর কালী প্রসন্ন সিংহ এর দ্বিতীয় সম্পাদক হন। তাঁর সহকারী ছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। কালীপ্রসন্ন অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত বিবিধার্থ সংগ্রহের সপ্তম পর্বের (১৭৮৩ শক) মাত্র বৈশাখ—অগ্রহায়ণ সংখ্যা সম্পাদন করে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। তাঁর অবসর গ্রহণের সাথে সাথেই পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটে। 'বিবিধার্থের' বিদায় একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সংঘটনের সাথে জড়িত। আমরা জানি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত মাইকেল মধুসূদন কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত নীলদর্পণ নাটক প্রকাশ ও প্রচারের অভিযোগে নীলকরদের অভিযোগক্রমে পাদ্রী লঙ্ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গভর্ণমেন্টের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের' আষাঢ় সংখ্যায় (১৭৮৩ শক) কালীপ্রসন্ন মূল নীলদর্পণ নাটকের বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশ করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ রুষ্ট হন এবং পত্রিকাখানির পরিচালন বন্ধ হয়ে যায়।

১৭৭৩ শক (১৮৫১) থেকে ১৭৮৩ শক (১৮৬১) পর্যন্ত দশ বছরের বেশী সময় ধ'রে পত্রিকাটি, অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হলেও, অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল। তখনকার কোন সাময়িক পত্রের পক্ষে এটা কম কথা নয়। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' বস্তুতঃই আমাদের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের মত জ্ঞানী, গুণী ও আদর্শনিষ্ঠ মনীষীর প্রচেষ্টায়ই 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' একটি উচ্চমানের মাসিক পত্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' "পুরাবৃত্তেতিহাস, প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক-পত্র" ছিল। মানুষের বুদ্ধিকে সজাগ ও চিত্তবৃত্তিকে সজীব রাখার পবিত্র দায়িত্ব পালনে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' সম্পাদকের নিষ্ঠা রীতিমত বিস্ময়কর ছিল। প্রতিমাসে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের আলোচনায় এর কলেবর পূর্ণ থাকত। শুধু তাই নয়, বাঙ্‌লা সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও আলোচনায় আগ্রহ সৃষ্টি করাও 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের' ব্রত ছিল। একদিকে বিভিন্ন সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থের সারবস্তু আলোচিত হত ও কবি সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাহিত্য-সাধনার পরিচয় সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত; অন্যদিকে খ্যাত-অখ্যাত গ্রন্থকারদের পুস্তকের যথার্থ সমালোচনাও ঐ পত্রে স্থান পেত। বাঙ্‌লাদেশে একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া গড়ে তুলতে, বাঙালী পাঠক ও সাহিত্যিক-দের মধ্যে হৃদয়ের সংযোগ সাধনে, নতুন সাহিত্যিকদের উৎসাহদানে ও পরিণতির পথ প্রদর্শনে, নতুন সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে, দেশের সাহিত্যরুচিকে উন্নত ও সুস্থ করে

গড়ে তোলার জন্যে। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। সমকালীন বাঙলাদেশের সাহিত্য চিন্তার স্বরূপ বুঝতে হলে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র পাতায়ই তার সন্ধান পাওয়া যাবে। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' সম্পাদক সুস্থ সাহিত্য চেতনা গড়ে তোলার জন্যে উচ্চমানের গ্রন্থ-সমালোচনা ছাড়াও, সাহিত্য-তত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করতেন। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য শাস্ত্র-সম্মত যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে দেশীয় সাহিত্য-বিচারের প্রচেষ্টাও এই পত্রেই প্রথম দেখা যায়। তখনকার প্রায় সকল বিখ্যাত লেখকের রচনারই সমালোচনা 'বিবিধার্থে' প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির অনেক রচনার রসজ্ঞ সমালোচনা 'বিবিধার্থে' প্রকাশিত হয়েছিল। এ সকল বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকের রচনা সম্পর্কে 'বিবিধার্থের' বক্তব্য আজও অনেকস্থলে প্রামাণ্য বলে গৃহীত হওয়ার দাবী রাখে। আশ্চর্য নির্ভুল রসজ্ঞানের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এ সকল আলোচনায়। বস্তুতঃ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' পুস্তক সমালোচনা পড়ে সমকালীন পাঠক-রুচি অনেকটা পরিমার্জিত হয়েছিল। অনেক অক্ষম লেখকের ব্যর্থ রচনা 'বিবিধার্থে'র সমালোচনায় আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সমালোচনা যে একটি পবিত্র দায়িত্ব সে সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যেত 'বিবিধার্থে'র সম্পাদকীয় বক্তব্যে। 'বিবিধার্থে'র পাতায় চোখ বুলালেই লক্ষ্য করা যায় কয়েক সংখ্যা পর পরই সম্পাদক 'সমালোচনা কার্য সম্পর্কে কিছু না কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন। এসব বক্তব্য থেকে এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে সম্পাদক সমালোচনা কর্মের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেই এ কার্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই সমালোচনার নামে অযথা কটূক্তি ও গালিবর্ষণ 'বিবিধার্থে'র পাতায় বড় একটা দেখা যায় না। বরং লক্ষ্য করা যায় প্রচুর ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও কোন গ্রন্থে সামান্যগুণের আভাস থাকলেও 'বিবিধার্থ' সম্পাদক তার প্রশংসায় পিছ-পা হন নি। তবে কোন কোন কোন অক্ষম লেখকের ব্যর্থ রচনার প্রতি মাঝে মাঝে নির্মম ব্যঙ্গের পরিচয় মিলে। মোট কথা 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' সুস্থ সমালোচনা কর্মের উপযোগিতার কথা সেদিন দেশবাসীকে উপলব্ধি করাতে পেরেছিল। সেদিনকার বাঙালীর সাহিত্যরুচিকে গড়ে তুলতে, নতুন সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের জন্যে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' যা করেছে তার জন্যে এ মাসিক পত্র বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। 'বাঙ্লা সাহিত্যের ইতিহাসে'র লেখক সুকুমার সেন যথার্থ বলেছেন: "ইংরেজি হইতে বহু সুপাঠ্য গ্রন্থ অনুবাদ ও নিতান্ত স্বল্পমূল্যে প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্দিনে উপকার করিয়া গিয়াছে। রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'-এর প্রকাশ (১৮৫১) সমাজের বোধকরি সব চেয়ে বড় কাজ।"[২]

'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র কপি আজ দুষ্প্রাপ্য। অনেক কৌতূহলী পাঠকের ইচ্ছা তাই পরিতৃপ্তির সুযোগ পাচ্ছে না। বাঙ্লার নবীন সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের জন্যে, সমকালীন বাঙালী সাহিত্যিক ও পাঠকদিগকে উন্নত রসরুচির অধিকারী করে তোলার জন্যে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' সেদিন যে প্রচেষ্টা জানিয়েছিল তার ব্যাপকতা ও ঐকান্তিকতা বিস্ময়করই বটে। পুরাতন 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র পাতায় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে কৌতূহলী পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্যে আমরা 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের' পাতা থেকে কিছু কিছু তথ্য উদ্ধৃত করছি। তা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সেদিন আমাদের সাহিত্য-রসবোধ জাগ্রত করতে, জাতীয় চিত্তকে সরস ও সজীব করে তুলতে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' কি আশ্চর্য আদর্শ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিল। স্মরণ রাখা দরকার 'বিবিধার্থের' এই সাহিত্য-কলা-কৌতূহল সমকালীন বাঙ্লা সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। সংস্কৃত-সাহিত্য, ফারসী-সাহিত্য, পাশ্চাত্য সাহিত্যের রসভাণ্ডারের সাথেও 'বিবিধার্থ' সমকালীন পাঠকের পরিচয় ঘটাতে ত্রুটি করে নি। বিচিত্রের যোগে বাঙ্লা-ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাত্মক বিকাশই এ পত্রিকার কাম্য ছিল।

১৮৫১ সাল থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে পত্রিকাটির বিলুপ্তির সময় পর্যন্ত 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' বিভিন্ন সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের সারসঙ্কলন, সাহিত্যসাধকদের জীবনী ও সাহিত্যসাধনার আলোচনা ছাড়াও সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তথ্যনির্ভর যে সমস্ত উল্লেখ যোগ্য নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তা রীতিমত উল্লেখযোগ্য। পরিমাণের দিক থেকে

---

২ সুকুমার সেন: বাঙ্লা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ১৭।

নয়, গুণের দিক থেকে। এখানে আমরা শুধু বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা সমূহের কথা উল্লেখ করছি ঃ

(ক) কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেন। লেখক হরিমোহন সেন সংক্ষেপে হ. মো. সে. ( ১ম পর্ব, ৫ম সংখ্যা )।

(খ) সাহিত্য বিবেক। ১ম পর্ব, ১১শ সংখ্যা )।

(গ) প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের মর্মকথা। মহাকবি শ্রীকৃষ্ণ মিত্রের সংস্কৃত নাটকের সারসঙ্কলন (২য় পর্ব, ১৫শ খণ্ড )।

(ঘ) কাদম্বরী সারসংগ্রহ ( ২য় পর্ব, ১৬শ খণ্ড )।

(ঙ) রত্নাবলী নাটকের সংক্ষেপ ইতিহাস ( ২য় পর্ব, ১৬শ খণ্ড )।

(চ) প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের আলোচনা ( ২য় পর্ব, ১৭শ খণ্ড )।

(ছ) ভারতচন্দ্র রায়—শ্রী হরিমোহন সেন ( ৩য় পর্ব, ২৭শ খণ্ড )।

(জ) পারস্যদেশ প্রচলিত গোলেস্তান নামক নীতি শাস্ত্রের প্রসঙ্গ (৩য় পর্ব, ৩০শ খণ্ড )।

(ঝ) কুলীনকুল সর্বস্ব-নাটকের সমালোচন (৩য় পর্ব, ৩৫শ খণ্ড )।

(ঞ) শ্রী যুত রামনারায়ণ তর্ক সিদ্ধান্ত কর্তৃক অনুবাদিত বেণী সংহার নাটকের সমালোচন ( ৪র্থ পর্ব, ৪১শ খণ্ড )

(ট) রত্নাবলী নাটকের সমালোচন ( পৃঃ ১৭-২৩ ) [ পঞ্চম পর্ব, ৪৯শ খণ্ড]

এ সব প্রবন্ধ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থ সমালোচনা উপলক্ষে সম্পাদকীয় কলম থেকে সমালোচনা সাহিত্যের কার্যকারিতা, সুষ্ঠু সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টির অসুবিধে সম্পর্কে যে সব বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধের গুণ পরিদৃষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের' চতুর্থ পর্বের ৩৮শ খণ্ড, ৪২শ খণ্ড, ৪৩শ খণ্ড, ৫ম পর্বের ৬০ খণ্ডের উক্ত বিষয়ক বক্তব্য উল্লেখ যোগ্য। তা'ছাড়া সমকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের পুস্তক সমালোচনা তো উচ্চাঙ্গের রসবোধের নিদর্শন স্বরূপ রয়েছেই। প্রসঙ্গত আমরা বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতির গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনার কথা উল্লেখ করতে পারি।

'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র পাতায় আলোচিত বিখ্যাত লেখকদের গ্রন্থগুলোর নাম এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

(ক) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
(খ) কুলীন-কুল সর্বস্ব নাটক—রামনারায়ণ তর্করত্ন।
(গ) আলালের ঘরের দুলাল—টেকচাঁদ ঠাকুর
(ঘ) স্বপ্ন দর্শন—বিহারীলাল চক্রবর্তী।
(ঙ) পদ্মিনী উপাখ্যান—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
(চ) একেই কি বলে সভ্যতা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
(ছ) তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য— ঐ
(জ) পদ্মাবতী (নাটক)— ঐ
(ঝ) অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক—রামনারায়ণ তর্করত্ন।
(ঞ) নীলদর্পণ নাটক—দীনবন্ধু মিত্র।
(ট) মেঘনাদ বধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
(ঠ) ব্রজাঙ্গনা কাব্য— ঐ

এ সব মূল্যবান গ্রন্থের বিশদ আলোচনা ছাড়াও সংক্ষেপে বহু গ্রন্থ "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের" পাতায় আলোচিত হয়েছে। শুধু বাঙ্‌লা গ্রন্থ নয় এবং সাহিত্য গ্রন্থ নয়, সংস্কৃত গ্রন্থ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদিরও আলোচনা 'বিবিধার্থে' থাকত। অল্পকথায় পুস্তক সম্পর্কে সুষ্ঠু বক্তব্য পেশের নির্ভুল জ্ঞান 'বিবিধার্থ' সম্পাদকের ছিল। রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং এ আলোচনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ও এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। সমালোচনা-প্রবন্ধাদিতে প্রায়শঃই লেখকের নাম না থাকাতে সব সময় নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, কে কোন্ প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে সাক্ষ্য প্রমাণ যা জুটেছে তাতে রাজেন্দ্রলাল ও কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ই যে এ সকল আলোচনা লিখেছেন তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কয়েকটি আলোচনার মালিকানা সম্পর্কে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এটা নিশ্চিত ভাবে জানা গিয়েছে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার নাটক', মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের আলোচনা রাজেন্দ্রলাল মিত্র করেছেন। ১৭৭৯ শকে (১৮৫৭ খ্রীঃ) 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র (কার্ত্তিক সংখ্যায়) নূতন গ্রন্থ সমালোচন কর্ম উপলক্ষে সমালোচনা

কাজের সমস্যা সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা এবং ১৭৮৩ শকের আষাঢ় সংখ্যায় দীনবন্ধুর "নীলদর্পণের'' সমালোচনা কালীপ্রসন্নই করেছিলেন। অধিকাংশ সমালোচনাই বেনামীতে হওয়ায় সকল নিবন্ধের রচয়িতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। যাহোক এ সকল মূল্যবান আলোচনার কৃতিত্বের অধিকাংশই সুযোগ্য সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্রাপ্য তাতে সন্দেহ নেই।

সমালোচন-কর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'-সম্পাদক যে কিরূপ সচেতন ছিলেন, তা' নূতন গ্রন্থ সমালোচন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মন্তব্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র চতুর্থ পর্বের, ৩৮শ খণ্ডে (শকাব্দ ১৭৭৯, জ্যৈষ্ঠ) সম্পাদক লিখ্ছেন—"গ্রাম্য গ্রন্থালয়' নামক প্রস্তাব রচনার সময়ে আমরা লিখিয়াছিলাম, যাহাতে সাধারণ লোকে নূতন গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়েন এতদর্থে সময়ে ২ বাঙ্গালাগ্রন্থের দোষগুণ বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার করিব এবং তদনুসারে পূর্বে কয়েকখানি গ্রন্থের সমালোচন করা হইয়াছিল। পরন্ত সে কর্ম কোন মতে আমাদিগের মনোনীত হয় নাই। গ্রন্থের প্রশংসা করা দুষ্কর কর্ম নহে; এবং প্রশংসাবাদে কিঞ্চিৎ অতিবাদ হইলে শাস্ত্রকারেরা নিতান্ত দূষণীয় বোধ করেন না; কিন্তু গ্রন্থের দোষোল্লেখ করা তাদৃশ সহজ ব্যাপার নহে; তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ভ্রম হইলে গ্রন্থকারের অনিষ্ট করা হয়; অধিকন্তু কোন গ্রন্থের যথার্থ দোষ প্রদর্শন করিলেও তৎসহ ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলের সহিত চিরকালের নিমিত্ত বিবাদ উপস্থিত হয়। অপর দোষগুণ অবিকল বর্ণন না করিলে সঙ্কল্পের হানি ও পাঠকদিগের সাহায্য না করিয়া ভ্রমকূপে নিক্ষিপ্ত করিতে হয়; সুতরাং উভয় কল্পেই সংকট এবং তাহার পরিহরণ করণার্থে নূতন গ্রন্থের সমালোচনা করা আমাদিগের পক্ষে অবিহিত বোধ হইয়াছিল পরন্ত দুষ্করত্ব বিধায়ে কোন কার্যের পরিহরণ করায় মনুষ্যত্বের হানি হয়। 'বিবিধার্থের' সম্পাদনে পাঠকবর্গের উপকার একমাত্র উদ্দেশ্য, তৎসাধনে সহস্র ক্লেশ-স্বীকার করা আমাদের কর্তব্য।''[৭] সমালোচকের যথার্থ কর্তব্য নির্দেশে সম্পাদক সার্থক হয়েছেন বল্‌তে হবে। সমালোচনার উদ্দেশ্য গ্রন্থের দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করে পাঠককে উপযুক্ত জ্ঞানদান করা ও তার রসবোধকে জাগ্রত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে

---

৭ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ৪র্থ পর্ব, ৩৮শ খণ্ড শকাব্দা ১৭৭৯, জ্যৈষ্ঠ পৃ: ৩৮

লেখককে উৎসাহ দান করা ও ত্রুটি সংশোধনে সাহায্য করা। এতে সমূহ কল্যাণ হয়। কিন্তু এ পক্ষে সার্থকতার পথে বাধাও কম নয়—সমালোচকের রসজ্ঞান নির্ভুল না হলে, তিনি সমালোচনার নামে পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারেন এবং লেখকের যথেষ্ট অনিষ্টের কারণ হতে পারেন। কিন্তু এটা সমালোচকের অনভিপ্রেত। তাছাড়া নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচনাও সকলের মন জয় করতে পারে না গ্রন্থের দোষ বর্ণনা শুনে অনেক সময় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমালোচকের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। কিন্তু এ অপ্রীতিকর ব্যাপারের ঝুঁকি নিয়েই সমালোচককে অগ্রসর হতে হবে। কারণ সমালোচকের একমাত্র উদ্দেশ্য 'পাঠকবর্গের উপকার'।

সমালোচন কর্ম সবসময় নির্ভুল হবে এমন আশা করা সমীচীন নয়। একই গ্রন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের মতভেদও অসম্ভব নয়। এ কথাও রাজেন্দ্রলাল স্বীকার করেছেন। তবুও সাহিত্যের বিকাশ ও কল্যাণ সাধনে সমালোচনার প্রয়োজনীয়তাকে যে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। রাজেন্দ্রলাল বলিষ্ঠভাবে সে-দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে সমালোচনার ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর এ-চেতনা, তাঁর আশ্চর্য দূরদৃষ্টি ও মনীষারই পরিচয় বহন করে। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' কর্তৃপক্ষকে পত্রে এ সমালোচন কার্য আরম্ভ করে কিরূপ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার আভাস পাই চতুর্থ পর্বের ৪২শ খণ্ডে নতুন গ্রন্থ সমালোচন উপলক্ষে সমালোচকের বক্তব্যে ঃ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' সম্পাদকের সাহায্য করিবার ব্রতে আমরা স্বয়ং বিব্রত হইবার সম্ভাবনা। যদিচ আমাদিগের নাম ব্যক্ত নাই, অতএব আমাদিগের প্রতি কাহারও বিরক্তি হইবার উপায় দেখিনা।……… বিবিধার্থ সম্পাদক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আমাদিগের অভিপ্রায়ের সহিত তাঁহার একতা নাই; সুতরাং আমাদিগের উক্তি তাঁহার প্রতি কেহ দ্বেষ করিবেন ইহা সম্ভব নহে; ফলতঃ প্রারম্ভাবধি 'বিবিধার্থ' এক প্রকার "বার ইয়ারী" পত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে প্রত্যেক লেখক স্বেচ্ছানুসারে পরস্পর বিরুদ্ধ আপন ২ অভিমত ব্যক্ত করেন, কেহ কাহার উপেক্ষা করেন না। সুতরাং এক প্রস্তাব লেখকের অপরাধে অন্য লেখকের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা কেহ রুষ্ট হইবেন এমত সম্ভাব্য নহে; তত্রাপি নূতন গ্রন্থের সমালোচন কোনমতে প্রিয়

সাধন হইতেছে না।"[৮] অজ্ঞতা ও রসজ্ঞানের অভাবে সমালোচন কর্মকে যথার্থভাবে গ্রহণ করবার মত মানসিক প্রস্তুতি তখনও সমাজের হয় নি। তাই সাহিত্য-সমালোচকের পথ তখনও প্রশস্ত হয়ে উঠেনি। অথচ দেশে ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যচর্চার সাথে সাথে গ্রন্থ প্রকাশনার পরিমাণ তখন রীতিমত বেড়ে উঠেছিল। খ্যাত অখ্যাতনামা বহুব্যক্তি 'কবিযশঃ প্রার্থী' হয়ে সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দিয়েও বলা যায়, তাঁরা গ্রন্থ প্রচারের নামে সাধারণ পাঠককে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করেছেন। সাহিত্যের নামে বিকৃত ভাষায় বিকৃত তথ্যপূর্ণ জ্ঞান পরিবেশন করে সমাজের ক্ষতি করছিলেন সমালোচকের সম্মার্জনী-ব্যতীত এ-অবস্থার প্রতিকার সম্ভব ছিল না। সাধারণ লোককে এ সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করে, সাহিত্য, সমাজ তথা দেশের কল্যাণ-সাধনের প্রয়োজনে সমালোচনার উপযোগিতা তাই বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়েছিল। এই বিরাট সমস্যা সম্পর্কে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের' ৪র্থ পর্বে ৪৩শ খণ্ডে কালীপ্রসন্ন সিংহ যে মূল্যবান আলোচনার অবতারণা করেছিলেন, তা 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' পত্রিকা কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টিরই পরিচয় বহন করে। জাতির কল্যাণ কামনার সাথে সাথে সাহিত্যের পবিত্র কল্যাণ ব্রতের প্রতি আস্থাই ফুটে উঠেছে এ আলোচনায়। বস্তুতঃ এ আলোচনা সমকালীন বাঙালীর সজাগ বুদ্ধি ও সজীব চিত্তবৃত্তিরই পরিচয় বহন করে

'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' এ-ক্ষেত্রে পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেছে। বাঙলা-সাহিত্যের রেনেসাঁস্‌কে ত্বরান্বিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে—একদিকে পাঠকের দৃষ্টিকে সৎ-সাহিত্যের দিকে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে জাতীয় মানসে উন্নত রস ও রুচিবোধের সঞ্চরণ ঘটিয়ে। এ কাজে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র হাতিয়ার ছিল নির্ভীক নিরপেক্ষ, নির্ভুল রসজ্ঞানপূর্ণ সাহিত্য সমালোচনা ও সদ্‌গ্রন্থাদির প্রচার ও আলোচনা। কতটা সমাজ সচেতনতা ও জাতীয় কল্যাণ কামনা এবং কতটা নিষ্ঠা ও আদর্শ নিয়ে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' এ দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছিল তা কালীপ্রসন্ন কৃত মূল্যবান আলোচনাটিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছিলেন:
"পুলিশের একখানি পত্র-পাঠে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে অধুনা কলিকাতায় ৯০টি

---

৮ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ': ৪র্থ পর্ব. ৪২শ খণ্ড, শকাব্দা ১৭৭৯, আশ্বিন পৃঃ ১২৭।

মুদ্রাযন্ত্র বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কনে নিযুক্ত আছে ; এতদ্ভিন্ন চব্বিশ পরগণা শ্রীরামপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে মুদ্রাযন্ত্র বর্ত্তমান আছে ······ সমস্ত যন্ত্রের বার্ষিক ক্রিয়ার সমষ্টি ডেড় কোটি পৃষ্ঠা বলিলে বোধ হয় প্রকৃতের বাত্যয় হইবেক না এই ডেড় কোটি পৃষ্ঠার সকল রচনাই যে উৎকৃষ্ট হইবে ইহা সম্ভাব্য নহে ; তন্মধ্যে উত্তম মধ্যম অধম সকল প্রকার রচনাই প্রকটিত হইয়া থাকে। ঐ সকল রচনার মধ্যে উত্তমগুলিনই আমাদের পাঠকবর্গ গ্রহণ করেন এই আমাদের উদ্দেশ্য ; এবং তন্নিমিত্তই মধ্যে ২ নূতন গ্রন্থের সমালোচন করিয়া থাকি। ইহাতে আমাদিগের স্বকীয় কোন উপকার দর্শে না ; প্রত্যুত ইহাতে অনিষ্টই সম্ভাবনীয়, যে হেতু গ্রন্থকারেরা আমাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন।"[৯] গ্রন্থ-সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন : "অনেক বালক ও বনিতারা 'বিবিধার্থ' পাঠ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই যে সকল গ্রন্থের গুণদোষ নিরূপণ করিতে সক্ষম হইবে ইহা সম্ভাব্য নহে এবং তাহাদিগকে যে কোন গ্রন্থ পাঠ করাইয়া ভ্রমান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করাও তাহাদের হিতাকাঙ্খিদিগের কর্ত্তব্য নহে ; সুতরাং উপদেষ্টার সম্যক প্রয়োজন রহিয়াছে।"[১০] 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' এ উপদেষ্টার পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। সমালোচনা কার্যের অন্যবিধ প্রয়োজনীয়তার কথাও সমালোচক বলেছেন। ভূরি ভূরি পুস্তক সৃষ্টি করাই বড় কথা নয় ঐগুলো সারবান সৃষ্টি হল কিনা তাও বিচার করে দেখা প্রয়োজন তাই প্রতিমাসে বহু পুস্তকের মুদ্রণের ব্যাপার উল্লেখ করে 'বিবিধার্থ' এর সমালোচক বলেছেন, "তৎসমুদয়ই সুপণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত নহে, সুতরাং তন্মধ্যে অনেক অশ্লীল অনিষ্টকর শাস্ত্র বিরুদ্ধ বাক্য প্রবিষ্ট থাকে ; এবং অনেকে প্রত্যহ নব্যরচনায় নিযুক্ত হইয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ প্রাচীন ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কারাদি-শাস্ত্রের তথা সত্যের অপনয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন ; তাঁহাদিগের দমন বা অজ্ঞানাপহরণ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।"[১১] এ কাজের জন্যে সমালোচনা অরিহার্য। এ কাজ যে খুব সহজ নয় তা সমালোচক ভালভাবেই জানতেন। এ কাজ একমাত্র পণ্ডিতেরই সাধ্য এই বলে দূরে সরে থাকা 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র আলোচ্য সমালোচকের

---

৯ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ৪র্থ পর্ব, ৪৩ খণ্ড, শকা ১৬৭৯ (১৮৫৭) কার্ত্তিক [পৃঃ ১৬৪-১৬৮]

১০ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১১ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

অভিপ্রায় ছিল না। কাজের গুরুত্ব স্বীকার করেই তিনি বলেছেন—"সম্পূর্ণ গুণী না হইলে যে গুণীর গুণ দোষ অনুভূত করা যায় না ইহা আমরা স্বীকার করি না। ফলতঃ সামান্য কথায় বলে "খেলাড়ী হইতে উপল চালে দেখে ভাল" এবং পাঠকদিগেরও সেই অবস্থা।"[১২] তখনকার অন্য কোন সাময়িক পত্রে গ্রন্থ-সমালোচন দৃষ্ট হত না। সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে এ ব্যাপারটা ছিল খুবই অনিষ্টকর। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিলেন সে-কথা স্মরণ করেও বটে। কেউ এ-ব্যাপারে এগিয়ে এলে অনেকেই গ্রন্থ সমালোচনে উৎসাহী হবেন এ-কথা চিন্তা করেই সমালোচক লিখেছেন—"অপর যে সকল সাময়িক পত্র অধুনা প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহার কোন পত্রে নূতন গ্রন্থের সমালোচন হয় না ; সুতরাং এ বিষয়ের প্রারম্ভ করিলে পণ্ডিত সম্পাদকদিগের তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ হইতে পারে ; তাহা হইলেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ; অতএব যে পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে অন্যে না প্রবৃত্ত হইতেছেন তদবধি আমাদিগের এতৎ কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় পাঠকদিগের উপকার ও পরিতুষ্টির সম্ভাবনা।"[১৩] বিস্মিত হতে হয় ভেবে যে, যে যুগে সমালোচনাকে লোকে নিন্দাবাদ বলে মূল্য দিতে চাইত না, সে যুগে কি আশ্চর্য দূরদর্শিতার পরিচয়ই না দিয়েছেন 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' কর্তৃপক্ষ বলিষ্ঠভাবে সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত করে।

সমালোচনা সম্পর্কে যে একটা ভুল ধারণা, একটা কুসংস্কার সমাজ মানসে ছিল, 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' তা দূর করতে সাহায্য করেছে ; পরন্তু সমালোচনার উদ্দেশ্য যে নিন্দা নয়, বরং লেখকদের সাধনার যথার্থ স্বীকৃতি দান ও তাঁদের প্রতি সমাজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, এ বলিষ্ঠ ঘোষণাও 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' করেছিল : "কথিত আছে সাময়িক পত্র সাধারণের মুখস্বরূপ, আমরা সেই বাক্যে নির্ভর করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা বিবিধার্থে ব্যক্ত করিতেছি ; এবং ভরসা করি গ্রন্থকার মহাশয়েরা এই আবেদন গ্রাহ্য করিবেন। আমরা স্বয়ং রচনা-ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছি ; আমাদিগের রচনায় নিন্দা না হয় ইহা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইতে পারে না ; অতএব রচনামাত্রের নিন্দা না হয় এই উপায় করিতে পারিলে মাদৃশ অপক্কমতিদিগের বিশেষ

---

১২ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'- ৪র্থ পর্ব, ৪৩শ খণ্ড, শকাব্দা ১৭৭৯ (১৮৫৭) কার্ত্তিক [পৃঃ ১৬৪-১৬৮]
১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

উপকার ; তদ্বিরুদ্ধে গুণদোষ সমালোচনের প্রথা প্রচলিত করাতে আমাদিগের কেবল সাধারণের উপকার উদ্দেশ্য হইয়াছে।”[১৪] এখানে ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে’র গ্রন্থ সমালোচক যে নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা সবিশেষ প্রশংসনীয়। সমালোচনা কাজের সার্থকতা সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন : “এইক্ষণে বঙ্গভাষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে, এবং সেই উন্নতি যথা নিয়মে সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইলেই উত্তম হয় ; তদন্যথা হইলে প্রমাদের সম্ভাবনা। অপর উত্তম গ্রন্থের পাঠনান্তর তাহার প্রশংসা না করিয়া নিরস্ত থাকা ক্লেশকর হয়, এই প্রযুক্তও নূতন গ্রন্থের দোষগুণের বিচার করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে।”[১৫] সমালোচনার মাধ্যমে একদিকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের রসাস্বাদন, আর একদিকে সাহিত্যের উন্নতির জন্যে একটি সুশৃঙ্খল বিকাশধারা সৃষ্টির তাগিদে ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’ বাঙ্‌লা গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তা হ’লে দেখা যাচ্ছে ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’ সম্পাদক একটা সুস্থ সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সেদিন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে সাময়িক পত্রের যে একটা ভূমিকা রয়েছে, সে সম্পর্কে ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’ সম্পাদক যে সচেতন ছিলেন, তা জানতে পারি চতুর্থ পর্বের ৪৮শ খণ্ডে প্রকাশিত একটি মন্তব্যে : “পুস্তকের বিজ্ঞপ্তি ও বহুল প্রচারের জন্য বিলাতী রীতি অনুসরণে আমাদের দেশেও সাময়িক পত্রের সম্পাদকদের দপ্তরে সদ্য প্রকাশিত পুস্তকের কপি পাঠানোর প্রয়োজন রহিয়াছে।”[১৬] ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’ আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিকাশের সেই প্রথম যুগে এইভাবে মানুষের কৌতূহল বৃত্তিকে জাগিয়ে, সুস্থ স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের প্রবণতা জাগিয়ে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ ও চিত্তবৃত্তিকে সজীবতা দান করে একটা সুস্থ সাহিত্য-আন্দোলনের সূচনা করেছিল। পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদর্শনে তা রীতিমত একটা আন্দোলন রূপে গড়ে উঠেছিল।

‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে’ সাহিত্য-সমালোচনা কর্মের মূল্য অনুধাবনে যে আশ্চর্য মনীষা, দূরদৃষ্টির পরিচয় মেলে তা রীতিমত বিস্ময়কর। সমালোচনার সার্থকতার

---

১৪ ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’- ৪র্থ পর্ব, ৪৩শ খণ্ড। শকাব্দা ১৭৭৯, কার্ত্তিক পৃ: ১৬৪-১৬৮।

১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১৬ ঐ ঐ ৪৮শ খণ্ড। ঐ চৈত্র

স্বপক্ষে আজও আমরা এর চেয়ে খুব বেশী কিছু বল্‌তে পেরেছি কি ? আমাদের কথার ভঙ্গী হয়ত বদ্‌লেছে ; বক্তব্যের তেমন বদল হয় নি। তা ছাড়া সাময়িক পত্রের ভূমিকা সম্পর্কেও 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র বক্তব্য আজও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র পৃষ্ঠায় কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাধনা-সম্পর্কিত আলোচনা, উচ্চাঙ্গের পুস্তক সমালোচনা আজও আমাদের সপ্রশংস সমর্থন দাবী করে। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রঙ্গলাল, দীন বন্ধু, রামনারায়ণ প্রভৃতির রচনা সম্পর্কে বিবিধার্থের মতামত অনেকটা অভ্রান্তই প্রতিপন্ন হয়েছে। এঁদের উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টির দোষ গুণ আশ্চর্য নিপুণতার সাথে উল্লেখ করেছেন সমালোচক। গুণের প্রশংসায় যেমন 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের' অনীহা ছিল না, তেমনি অক্ষম লেখকের দুর্বল রচনার প্রতি ছিল চরম বিতৃষ্ণা। সে বিতৃষ্ণ মনোভাব বলিষ্ঠভাবে প্রকাশেও 'বিবিধার্থ' পিছ-পা হয় নি। অবশ্য মাঝে মাঝে ঐ সকল লেখক ও রচনা সম্পর্কে কটূক্তি বর্ষিত হওয়ায় এ সব আলোচনার মান কিছুটা ক্ষুণ্ণও হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা হরচন্দ্র ঘোষ কৃত 'কৌরব বিজয়' নাটকের সমালোচনা( ৬ষ্ঠ পর্ব, ৬১ খণ্ড ), দীননাথ ধরের 'কংসবিনাশ কাব্যে'র সমালোচনা ( ৭ম পর্ব, ৭৮ খণ্ড ), শ্রীশ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'রাম বনবাস' গদ্য কাব্যের সমালোচনার ( ৭ম পর্ব, ৭৯ খণ্ড ) উল্লেখ করতে পারি। এসব গ্রন্থের রচয়িতার অক্ষমতাকে 'বিবিধার্থ' একেবারে বরদাস্ত করতে পারে নি। সমালোচক নির্মম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ফেটে পড়েছেন। এসব বক্তব্যে Polemics ( বিতর্ক-মূলক রচনা ) এর গন্ধ পাওয়া যায়। তাই বক্তব্য কিছুটা ঝাঁজালো হলেও রসিক মন এতে প্রচুর আনন্দ ও কৌতুকের খোরাক পায়। কিন্তু নির্মমতা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় সমালোচকের বক্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কৌতূহলী পাঠক 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র সন্ধান পেলে এগুলো পড়ে দেখতে পারেন। আমরা এখানে সে সব সমালোচনা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এইগুলো সমালোচকের নির্ভুল রসজ্ঞান ও নির্ভীক মত প্রকাশের সৎসাহসের পরিচয়ই বহন করে।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ বিরচিত 'কৌরব বিয়োগ' নাটকের আলোচনার শুরুতেই সমালোচক গ্রন্থ-পরিচিতিমূলক যে বক্তব্য ক্রোড়পত্রে নামের সাথে যুক্ত হয়েছে তা নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। ক্রোড়পত্রে লেখা ছিল "কৌরব বিয়োগ নাটক। এতাবতা রাজা দুর্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি অন্ধরাজের যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত মহাভারতীয় অপূর্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশে গদ্যে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্যছন্দে শ্রীযুক্ত

... লাইব্রেরী ... বিভাগ

হরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত।” সমালোচক লিখ্‌ছেন—“যদ্যপি কেহ গ্রন্থকারের ব্যবসায় জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি এই নামে “এতাবতা” শব্দদ্বারা সে অভীষ্ট অনায়াসে সিদ্ধ করিতে পারেন। আমরা কেবল ডিকরি-নবীস্‌দিগের মুখে ঐ শব্দ শুনিয়াছি। পরন্তু এতাবৎ শব্দের তৃতীয়ার একবচনের সহিত গ্রন্থের নামের সম্বন্ধ কি তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে অসমর্থ হইলাম।”[১৭] লক্ষ্য করুন, খোঁচাটা কিরূপ মারাত্মক, অথচ অসঙ্গত এমন তো বলা যায় না। অতঃপর ব্যঙ্গভরে গ্রন্থটিকে “নাটক-কণ্টক” রূপে আখ্যায়িত করে লেখকের অক্ষমতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ সেক্‌স্‌পীয়র কৃত Merchant of Venice এর অনুবাদমূলক রচনা ‘ভানুমতী-চিত্ত-বিলাসের ব্যর্থতার কথা ইঙ্গিত করে গ্রন্থের প্রস্তাবনার উক্তি—“আমার পরিশ্রমের ফল নাটকস্বরূপ পরিণত করত বিহিত সাবধানে তাহা দেশস্থ সকল শ্রেণীর মনুষ্যদিগের আস্বাদনোপযোগ্য করিয়া সাধারণ সমীপে সমর্পিত করিতেছি,”--এর সমালোচনা করে বলেছেন—“এই উৎসাহ বাক্যে আমাদিগকে ‘কৌরব বিয়োগ নাটক’ প্রয়াস পাইয়া পাঠ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে আমাদিগের শ্রম সাকল্যে ব্যর্থ হইয়াছে; বোধ হয় তৎসদৃশ নিস্ফল নিরর্থক অসংলগ্ন ১৭৬ পৃষ্ঠা পরীক্ষিত বাঙ্গালি রচনা কেহ এক কালে পাঠ করেন নাই। নাট্যকারের শব্দজ্ঞান আছে, বোধ হয় তিনি সমস্ত অভিধান কণ্ঠস্থ করিয়া থাকিবেন; পদ্যরচনায়ও তাঁহার ক্ষমতার অভাব নাই। আক্ষেপের বিষয় এই যে বিবেচনার অভাব, ব্যাকরণের অবহেলা, ও নাটক-রচনার নিয়ম না জানা প্রযুক্ত তাঁহার সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়াছে।”[১৮] অতঃপর সবিস্তারে নাটকের সহস্র দোষের কথা বলে হয়েছে। বিদ্রূপের খোঁচায় বিদ্ধ করা হয়েছে এ পণ্ডিতম্মন্য লেখককে পদে পদে। গোটা আলোচনাটি যেমনি উপভোগ্য, তেমনি তথ্যবহুল। ৭ম পর্বের ৭৮ খণ্ডে দীননাথ ধর প্রণীত ‘বংসবিনাশ কাব্যে’র সমালোচনা আরও নির্মম। প্রথমে বাঙ্‌লায় সুষ্ঠু সমালোচনা প্রথার অভাবের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে এবং তার ফলে সাহিত্যের নামে আজে বাজে গ্রন্থ সৃষ্টির জন্যে আক্ষেপ করা হয়েছে—“এক্ষণে বাঙ্গালি ভাষায় যত কদর্য্য ও ভয়ানক ভাব-পরিপূরিত

---

১৭ ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’—ষষ্ঠ পর্ব, ৬১ খণ্ড, শকাব্দা ১৭৮১, বৈশাখ পৃঃ ২০-২৪।

১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২০-২৪।

দোষাবহ পুস্তক প্রচারিত হইতেছে, পৃথিবীর অপর ভাষায় কখনই এরূপ হয় নাই।"[১৯] তাই সমালোচনা কর্মের যে বিশেষ প্রয়োজন তা বেশ জোর দিয়ে বলা হয়েছে এবং সমালোচনা কর্মের বিপক্ষীয়দের দুর্বলযুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে অতঃপর 'কংসবিনাশ' কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে—"গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ ধর এই অমূল্য কাব্য প্রচার মাত্রই একখণ্ড আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন; আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করত আনুপূর্বিক পাঠ করিয়া দেখিলাম কংসবিনাশ কাব্য ভস্ম পরিপূরিত স্বুবর্ণ ঘটের ন্যায়। ইহার ছাপা, অক্ষর, পত্রাদি ও আবার মেঘনাদবধ কাব্যের অবিকল অনুরূপ, কেবল লেখা যারপর নাই কদর্য্য। কংশবিনাশ কাব্যকার দুরাশা-পরবশ হইয়াই সাধারণে এই কাব্য প্রচার করিয়াছেন; বাস্তবিক যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র গৌরবজ্ঞান আছে, যাঁহারে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইতে হইবে, তাঁহার এমন অপকৃষ্ট পুস্তক স্বনামে প্রচার করিতে গেলে বিলক্ষণ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইতে হইত, সন্দেহ নাই।"[২০] মেঘনাদ বধের অনুকরণে রচিত এ অপকৃষ্ট রচনাটিকে সমালোচক সহ্য করতে পারেন নি—কাব্য থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি যোগে এর অসারতা, এর শোচনীয় ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়ে সমালোচক বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করে বলেছেন—"মাইকেল 'মেঘনাদ বধ' কাব্য প্রস্তুত করিয়া সাহিত্য সংসারে বিলক্ষণ সম্মান লাভ করিলেন দেখিয়া দীননাথ ধর আর থাকিতে পারিলেন না; ঈর্ষাবশে তাঁহার হৃদয় নিয়ত দগ্ধ হইতে লাগিল, তিনি সমুদয় জগৎ অন্ধকার ও আপনারে অতি হীনভাগ্য বিবেচনা করিয়া জিগীষারোষপরবশ হইয়াই কংসবিনাশ কাব্য প্রস্তুত করিলেন; কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্য হইতে তাহা কত অপকৃষ্ট হইল সে সময় তাঁহার দগ্ধ হৃদয়ই তাঁহারে জানাইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার চৈতন্য হইল না; অবশেষে বিবেচনা করিলেন যদি ছাপায় তাঁহার কাব্য মেঘনাদের অবিকল দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অনেক অংশেও আপাতবাহ্যদৃশ্য বিচারকবর্গ সমীপেও প্রশংসা পাইতে পারিবেন। পাঠকগণ আপনারাই দেখুন কংসবিনাশ কাব্যকার কতদূর দুরাশাবশতাপন্ন; মাইকেলের কাব্যের প্রত্যেক পত্রে যে কয় পঁক্তি, এই পুস্তকে তাহার সংখ্যাতিরিক্ত দেখা যায় না; অথচ

---

১৯ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'—৭ম পর্ব, ৭৮ খণ্ড। শকাব্দা ১৭৮৩, আশ্বিন ১ পর্ব ২কল্প পৃঃ ১১৭-১২০।

২০ ঐ ঐ ঐ ঐ

মিলের অনুরোধে ধর বাবুকে প্রত্যেক চরণের পরার্দ্ধ পর গদ্যে প্রকাশ করিতে হইয়াছে।"[২১] সমালোচকের অভিযোগ নিঃসন্দেহে গুরুতর। তাই সমালোচক ঘৃণাভরে মন্তব্য করেছেন—"কংসবিনাশ কাব্য স্বল্পমূল্যে ক্রয় করাও নির্বোধের কার্য্য, তবে সহৃদয়ে বানর নর্ত্তন দর্শন করণার্থও অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, উন্মাদের বিজয়া জটার অপসাধনে সাহায্য করেন ; ইহাও ঐরূপ ব্যয়ে সন্নিবেশিত হইবেক ; ফলতঃ এমন উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে এতদ্রূপ মহাপকৃষ্ট পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই।"[২২] অতঃপর ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজিয়ে ওঠা এ জাতীয় গ্রন্থকারগণের উদ্দেশ্যে মোক্ষম ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করে সমালোচক বক্তব্য শেষ করেছেন—"এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি কংসবিনাশ গ্রন্থকারের ন্যায় মহাশয়েরা কিছু দিবস বিশ্রাম করুন। প্রকৃত গ্রন্থকারগণ সাহিত্য সংসারে প্রার্থনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে তাঁহারা গাত্রোত্থান করিবেন।"[২৩] গোটা সমালোচনা প্রবন্ধটি পড়তে পাড়লে পাঠক যে প্রচুর আমোদ পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করবেন সমালোচকের কাণ্ডজ্ঞান সবল ও সৎসাহস প্রচুর। আমরা আরও একটি আলোচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গের ছেদ টানছি। এটি ৭ম পর্ব ৭৯ খণ্ডে শ্রীশ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ নামীয় কোন বিদ্যালয় শিক্ষকের 'রামবনবাস' নামে গদ্য কাব্যের আলোচনা। প্রথমে সমালোচনা কর্মরূপ মহৎকাজে (অনেকের নিকট অপ্রিয় বোধ হলেও) অবিচল নিষ্ঠায় নিযুক্ত থাকার সঙ্কল্প প্রকাশ করে সমালোচক লিখেছেন : "রামবনবাস নামে করুণরস প্রধান একখানি গদ্যকাব্য প্রাপ্ত হইয়াছি ···· এই গ্রন্থের অবলম্বিত উপাখ্যান যেমন মনোহর, ইহার রচনা প্রণালী তাদৃশ কদার্য। বোধ হয়, গ্রন্থকার ইহা প্রণয়ন করিয়া কেবল রাজ-সভাতেই পাঠ করিয়াছিলেন, পুনরায় সংশোধন করিতে অবকাশ পান নাই, তাহা হইলে ইহাতে এত অধিক দোষ কথনই লক্ষিত হইত না।"[২৪] অতঃপর উদাহরণ সহ রচনার নানাবিধ দোষ প্রদর্শন করে সমালোচক

---

২১ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'—৭ম পর্ব, ৭৮ খণ্ড। শকাব্দা ১৭৮৩, আশ্বিন। ১ পর্ব, ২ কল্প পৃঃ ১১৭-১২০

২২ ঐ ঐ ঐ ঐ

২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ

২৪ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'—৭ম পর্ব, ৭৯ খণ্ড, শকাব্দা ১৭৮৩, কার্ত্তিক। ১ পর্ব, ২ কল্প পৃঃ ১৩৭-১৪০

মন্তব্য করেছেন—"গ্রন্থকার যে অভিপ্রায়ে রামবনবাস পুস্তক প্রচার করুন না কেন, ইহা কোন প্রকারেই কিঞ্চিন্মাত্র অভীষ্ট সাধন করিবেক না, বরং "তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" এই সংস্কৃত শ্লোকেরই সার্থকতা হইয়াছে। ফলে এই সকল মহাপুরুষের হস্তেই বালকবর্গের শিক্ষাকার্য ন্যস্ত হওয়ায় বঙ্গদেশের হিত-চিকীর্ষু মাত্রেই বিলক্ষণ দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই।"[২৫] সমালোচকের স্বভাব-সিদ্ধ ব্যঙ্গপ্রিয়তা এখানেও প্রকাশ পেয়েছে। বাচনভঙ্গী আমাদের প্রচুর আমোদ দেয়, আমরা কৌতুক বোধ করি, সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকের অব্যর্থ ব্যঙ্গবাণ লক্ষ্যভেদও করে। বিবিধার্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে এমনি ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক অথচ আশ্চর্যরূপে বস্তুধর্মী তীক্ষ্ণ সমালোচনা। অন্য কারণে না হ'লেও বাচনভঙ্গীর রম্যতার জন্যে এগুলো এখনো পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ বলে আমাদের বিশ্বাস। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' এমনি করে তখনকার পাঠক ও লেখককে মাতিয়েছে, তাতিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ সাহিত্য-চেতনা গড়ে তুলতেও যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' শুধু অপকৃষ্ট রচনার প্রসারকে রোধ করতেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে নি, সঙ্গে সঙ্গে সৎসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। এই উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ লেখকদের উৎকৃষ্ট রচনা সমূহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 'বিবিধার্থ'র পাতায় প্রচার করা হত। পাঠকরা যাতে উৎকৃষ্ট রচনার সাথে বেশী করে পরিচিত হয় এবং অপকৃষ্ট গ্রন্থ পরিহার করে সদ্‌গ্রন্থ নির্বাচনের উপযুক্ত রসবোধ ও উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হয়, তার জন্যে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' কর্তৃপক্ষের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই জন্যে 'বিবিধার্থ' সব সময়ই দেশের খ্যাতিমান্ লেখকদের রচনা প্রচারে যত্নবান ছিল। এ সকল ভাল রচনার আলোচনায় সমালোচক নিজের সকল জ্ঞান-বুদ্ধি উজাড় করে দিতেন। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারদের রচনার গুণকীর্তন করেই 'বিবিধার্থ' কর্তব্য সমাধা করে নি, সে-সব রচনার ক্ষেত্রবিশেষের ত্রুটি ও অসঙ্গতি দেখিয়ে দিতেও পিছ-পা হয় নি। এতে করে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' একটা নির্ভীক, নিরপেক্ষ সমালোচনার ধারা প্রবর্তন করে বাঙ্‌লা-ভাষা ও সাহিত্যের অশেষ কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে গেছে। সমকালীন বাঙ্‌লাদেশের শ্রেষ্ঠলেখকদের রচনা সম্পর্কে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র বক্তব্য

---

২৫ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'— ৭ম পর্ব, ৭৯ খণ্ড, শকাব্দা ১৭৮৩, কার্ত্তিক। ১ পর্ব, ২ কল্প পৃঃ ১৩৭-১৪০

আজও বোধ হয় মূল্যহীন হয়ে পড়ে নি। আজ অনেক রচনার নতুন করে ব্যাখ্যা হচ্ছে, নতুন মূল্যমানে নতুন করে মূল্যায়ণের কাজ চল্‌ছে তবু এসব রচনা সম্পর্কে 'বিবিধার্থের' বক্তব্যের সাথে মৌল পার্থক্য দেখা দেয় নি। এসবই 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' সমালোচকের নির্ভুল রসজ্ঞান ও উন্নত সাহিত্যচেতনার পরিচয় বহন করে। আমরা এখানে বিখ্যাত লেখকদের বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে 'বিবিধার্থে'র সমালোচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। কৌতূহলী পাঠক পুরাতন 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র পাতায় তার বিস্তৃত পরিচয় পেতে পারেন।

প্রথমেই আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত গ্রন্থ 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবের' (২য় পর্ব, ২১ খণ্ড) 'বিবিধার্থ' কৃত সমালোচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি: "কলিকাতাস্থ বিটন সোসাইটি নামক সমাজে সৌর ফাল্গুনীয় অষ্টাবিংশ দিবসে সদ্‌গুণাকর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত যন্ত্রে সম্প্রতি তাহা সুচারু রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের নামোচ্চারণেই পাঠকবৃন্দের মনে উক্ত প্রস্তাবের ঔৎকর্ষ্য বিষয়ে নানাবিধ সম্ভাবের উদয় হইতে পারে; ফলত, তৎপাঠে কেহ অপরিতুষ্ট হইবেন না।...... উল্লিখিত প্রস্তাব সকল পূর্ব প্রকাশিত পুস্তক হইতে কোনমতে লাঘবাস্পদ নহে—বরং সারল্যগুণে উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে।"[২৬] অতঃপর পূর্ব প্রকাশিত বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি গ্রন্থের ভাষার কিছুটা দুর্বোধ্যতার কথা ইঙ্গিত করে সমালোচক লিখেছেন—" বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের স্থানে ২ উক্ত দোষ কেহ ২ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু উপস্থিত প্রস্তাবে তাহার লেশমাত্র নাই। সুমুধর কোমল ভাষায় রচিত হইয়া এই প্রস্তাব সরলতার শুক্লাম্বরে পরিশুদ্ধ রূপে বিভূষিত হইয়াছে। রচনার উৎকর্ষাপকর্ষ—বিষয়ে সকলের অভিপ্রায় কদাপি তুল্য হয় না, পরন্তু প্রস্তাবিত রচনা বঙ্গভাষায় গদ্য রচনার এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হইবেক, বলাতে বোধহয় অনেকেই আমাদিগের সপক্ষ হইবেন; একান্ততঃ আমাদিগের অনুরোধে উক্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া কাহারও শ্রম বিফল হইবে না।"[২৭] পরবর্ত্তীকালের

---

২৬ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ২য় পর্ব ২১ খণ্ড, শকাব্দা ১৭৭৫ (১৮৫৩), ভাদ্র। পৃঃ ১৯৬—২০০

২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ

সমালোচকদের কাছ থেকেও এ মন্তব্যের সমর্থন মিলেছে। এটা 'বিবিধার্থ' সমালোচকের নির্ভুল রসজ্ঞানের পরিচয় বহন করে না কি?

'বিবিধার্থে'র সমালোচক বইটার ভাষার প্রশংসা করেও এর আলোচনা-বস্তুর অপূর্ণতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে ভোলেন নি: "যদিচ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য এই উভয় বিষয়ই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, পরন্তু, ফলতঃ এই প্রস্তাব সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়েই ব্যাপৃত আছে। ইহার দুইপত্র মাত্র সংস্কৃত ভাষার প্ররোচক, এবং তাহাতেও সংস্কৃতের গুণকীর্তন মাত্র আছে। ভাষার ধর্ম ও লক্ষণ বিষয়ে প্রায় কিছুমাত্র উক্ত হয় নাই।"[২৮] এই অপূর্ণতার কথা উল্লেখ করেই সমালোচক লেখকের অসুবিধার কথা স্মরণ করে বলেছেন: "সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বহু বিস্তৃত; তৎসমুদায়ের বিবরণ কোন সমাজে বসিয়া নির্দ্দিষ্ট-অল্পকালের মধ্যে পাঠ করা কদাপি সম্ভবে না; এবং প্রস্তাব কর্ত্তারও সে অভিপ্রায় ছিল না। সংস্কৃত ভাষার প্রধান প্রধান কাব্য গ্রন্থের মূল মর্ম প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ও তদভিপ্রায়ে তিনি সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম হইয়াছেন।"[২৯] অতঃপর বিভিন্ন সংস্কৃত-সাহিত্য গ্রন্থ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের সারবত্তা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন—"তাঁহার অধিকাংশই অতি সদ্বিবেচনার সহিত লিখিত হইয়াছে। রচনার দোষগুণ নিরূপণে বিদ্যাসাগর বিশেষ তৎপর; কালিদাসের ক্ষমতা বিষয়ে তাঁহার উক্তি সর্বতোভাবে সত্য; তাঁহার লিপি চতুর্থের আদর্শস্বরূপে তাহা এস্থলে উদ্ধার করিলে বোধ হয়, সকলেই সুতৃপ্ত হইবেন।"[৩০] অতঃপর কালিদাস ও জয়দেব সম্পর্কে আলোচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করেও সমালোচক তাঁর পুস্তকের আরও দু'একটি ত্রুটি উল্লেখ করেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয় যমকাদি শব্দালঙ্কার বিশিষ্ট যে কএকটি চিত্রকাব্যের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা মনোহর বটে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তাহার অর্থ লিখিত হয় নাই; তদভাবে অনেকেরই রসাস্বাদনে অসক্ত হইবেন।"[৩১] অতঃপর সমালোচক আশা প্রকাশ করেছেন বিদ্যাসাগর

---

২৮ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ২য় পর্ব ২১ খণ্ড, শকাব্দা ১৭৭৫ ( ১৮৫৩ ), ভাদ্র। পৃ: ১৯৬—২০০

২৯ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'—২য় পর্ব, ২১ খণ্ড। শকাব্দা ১৭৭৫, ভাদ্র ১ পর্ব পৃ: ১৯৬-২০০।

৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ

মহাশয় এ বিষয়ে অবহিত হবেন। তিনি নিজে একটি অংশের বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছেন। আলোচনার এ প্রযত্ন বিস্ময়কর! এ নিষ্ঠা আজকের দিনেও দুর্লভ। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের রচনার ন্যায় তিনি অন্যত্রও আলোচনায় এই প্রযত্ন ও রসবোধের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (৩য় পর্ব, ৩৫ খণ্ড) বাঙ্‌লা নাটকের প্রথম যুগের সৃষ্টি। অনেক ত্রুটি সত্বেও বাঙ্‌লা-নাটকের ইতিহাসে এর কিছুটা মূল্য আছে। এ নাটকটিও 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' সমালোচিত হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে সমালোচক সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে নাটকের বৈশিষ্ট্য এবং এর অভিনবত্ব সম্পর্কে শাস্ত্র সম্মত আলোচনা করে নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "প্রস্তাবিত নাটকখানিতে রূপকের অনেক ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায়, উত্তম, ও ভাবও পরিশুদ্ধ।"... কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে তাহার রূপদান করাই ছিল নাটকের মুখ্য কল্প।"[৩২] এ পরিকল্পনার প্রাচীন পণ্ডিতদের আদর্শের প্রভাব উল্লেখ করে তিনি বলেছেন: "জগদীশ রচিত 'হাস্যার্ণবের রূপক' কুলীনকুলসর্বস্বের আদর্শস্বরূপ বলিলে বলা যায়।"[৩৩] অতঃপর এর আঙ্গিকগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করে নাটক সম্পর্কে সাধারণভাবে মন্তব্য করেছেন—"প্রস্তাবিত নাটকের আখ্যায়িকার কোন বিশেষ সৌন্দর্য নাই; কৌলীন্য মর্য্যাদাভিমানী কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া পরদিন এক অতিবৃদ্ধ কুলীন-পাত্রে আপন কন্যা চতুষ্টয়কে সম্প্রদান করাই ইহার মূল তাৎপর্য; পরন্তু সুকবি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় পরম চাতুর্য্যের সহিত সমান্য বিবাহের উদ্যোগে অনেকগুলি প্রসঙ্গ একত্রিত করিয়া অনেক ব্যক্তির চরিত অতি পরিপাটিরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন।"[৩৪] অতঃপর নাটকের বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করে লেখকের ত্রুটি ও কৃতিত্বের কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনায়ও যে সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও রসজ্ঞানের

---

৩২ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'- ৩য় পর্ব, ৩৫শ খণ্ড। শকাব্দা ১৭৭৬, মাঘ পৃঃ ২৫৩-২৬১।

৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩৪ ঐ ঐ ঐ ঐ

পরিচয় মিলে তা অসামান্য স্বীকার করতেই হয়। রামনারায়ণের আরও অনেক রচনা 'বিবিধার্থে' সমালোচিত হয়েছিল। আমরা বাহুল্যভয়ে সে সব থেকে উদ্ধৃতি দিতে ক্ষান্ত রইলাম।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র বিস্তৃত আলোচনা 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' (৫ম পর্ব, ৫৩ খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছিল। নানা কারণে এ আলোচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তখন বাঙ্‌লা সাহিত্যের আসরে সুকাব্যের বড় অভাব ছিল, কাব্যসৃষ্টির নামে যে অনাসৃষ্টি তখন চল্‌ত, তা যেমনি ছিল হাস্যকর, তেমনি পীড়াদায়ক। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' সেই ছুর্দিনে সার্থকতার বাণীবহন করে এনেছিল এবং সৎকাব্য সৃষ্টি সম্পর্কে দেশবাসীকে আশান্বিত করে তুলেছিল। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' কবিকে স্বাগত জানাতে গিয়ে বাঙ্‌লা কাব্যের ছুরবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে এক কৌতুককর দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন। প্রকারান্তরে অক্ষম কাবিযশঃ প্রার্থীদের বিদ্রূপ করেছেন। পরে রঙ্গলালের কৃতিত্বের কথা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি রঙ্গলালের রচনার গুণবর্ণন করতে গিয়ে, তাঁর দোষ বিস্মৃত হন নি। নিরপেক্ষ রসিক ব্যক্তির ন্যায় আপন বক্তব্য পেশ করেছেন। সুস্থ সমালোচনা কিরূপ হওয়া উচিত, তার আদর্শ হিসেবে এ রচনাটিকে তুলে ধরা যেতে পারে। আমরা এখানে আলোচনাটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :—

"আমরা শ্রুত আছি, একদা অপরাহ্ণে শরৎকালের মনোহর বায়ু সেবনার্থে তিনজন বিজয়ানুরক্ত নাগরিক প্রিয় বিজয়ার ধূপ আঘূর্ণিতনয়নে পথ ভ্রমণ করিতেছিল, ইত্যবসরে পথি মধ্যে একখানি শারদীয়া প্রতিমা দৃষ্টি গোচর হইল। পীত ধূমের মাহাত্ম্যেই নাগরিকদিগের কবিতা শক্তি প্রকৃষ্টরূপে উন্মত্তা ছিল, মহিষমর্দিনীর অপূর্বরূপ দর্শনে তাহা একেবারে উচ্ছ্বসিতা হইলে এক নাগরিক কহিলেন, "সখে, আইস, আমরা একটা কবিতা রচনা করি?" দ্বিতীয় নাগরিক তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "ভাই, তিনজনে তিনচরণ রচনা করিয়া কবিতা সম্পূর্ণ করিতে হইবে।" এই পণ স্থির হইলে প্রথম নাগরিক বিশেষ প্রযত্নে প্রথম চরণ রচনা করতঃ কহিলেন, "ওমা ভবের ভবানী"। দ্বিতীয় নাগরিক ভবানীর অনুপ্রাস রক্ষা করা কঠিন বোধে কহিলেন, "দূর মূর্খ, 'নী'রমীল কর্লি?" পরে অনেক কষ্টে অনুপ্রাস সিদ্ধ করিয়া কহিলেন, "কি শোভা সিঙ্গীর পীঠে চড়ান।" এই প্রকারে ছুই 'নীর'

২৪৫৫

অনুপ্রাস সাঙ্গ হইলে তৃতীয় নাগরিক মহাক্রোধে কহিলেন, "রে হতভাগা ? সমস্ত 'নীর' মীল শেষ কলি ?" এবং মানসিক সকল বৃত্তির পরিশ্রমে অনেক শিরো বেদনা ও ঘর্ম্মের পর 'নী'র অনুপ্রাস বিশিষ্ট তৃতীয়-পদ পূর্ণ করিলেন, যথা, 'ওমা সাপকে দিয়া চোরাকে কামড়ানী।" অধুনা কোন কোন নূতন পদ্য-গ্রন্থ দেখিলেই আমাদিগের মতে এই 'নী'র মীলের উপাখ্যান স্মরণ হয় ; যেহেতু যে কোন নব্য গ্রন্থ গ্রহণ করা যায় তাহাই অর্থ ও ভাববিহীন অকিঞ্চিৎকর অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ দেখা যায়। এই নিমিত্ত নব্য বাঙ্গালী-পদ্য দেখিলেই আমরা 'নীর' মীলের আশঙ্কায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকি। সম্প্রতি কোন কাব্য-প্রিয় বন্ধুর অনুরোধে "পদ্মিনী উপাখ্যান" নামা একখানি নূতন গ্রন্থ পাঠ করাতে আমাদিগের সে আশঙ্কার সমাধা হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ কবি বটেন, সন্দেহ নাই। তিনি আধুনিক কাব্যাভিমানিদিগের ন্যায় কএক শব্দালঙ্কারকেই কবিত্ব স্বীকার করেন না। ভাব ও অর্থই তাঁহার পূজ্য এবং এই দেবসেবায় তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন।"[৩৫] সমালোচক যে বিশেষ রসিক ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি অক্ষম কবি-দিগের নিয়ে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন তা আমাদের কৌতুক জন্মায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লা কাব্যের একটা ভয়াবহ দুরবস্থারও ইঙ্গিত করে। সেই দারুণ দুর্দিনে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যটি সার্থকতার আশ্বাস বহন করে এনেছিল দেশবাসীর মনে। রঙ্গলালের কাব্যকে স্বাগত জানিয়ে সমালোচক আপন নির্ভুল রসজ্ঞানের আর একবার পরিচয় দিলেন। রঙ্গলালের কাব্যটি সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন--"তাঁহার গ্রন্থ সদ্ভাবের আকর, এবং সেই ভাবসকল মনোহর ভঙ্গীতে অলঙ্কৃত হইয়াছে।"[৩৬] রঙ্গলালের এ কাব্যিক সার্থকতার জন্যে টডের।' 'রাজস্থান' গ্রন্থের ভীমসিংহ পদ্মিনীর উপাখ্যানটির সৌন্দর্য অনেক পরিমাণে দায়ী একথার ইঙ্গিত দিয়ে সমালোচক বলেছেন "একথা কহিয়া আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণগরিমা খর্ব করিতে সাহস করিনা। তিনি টডসাহেবকৃত ইংরাজী গদ্যের কএক পৃষ্ঠা হইতে সুদীর্ঘ কাব্য বিরচিত করিয়াছেন ; অতএব তাঁহার রচনা-শক্তির প্রশংসা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।"[৩৭]

---

৩৫ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'—৫ম পর্ব, ৫৩ খণ্ড, শকাব্দা ১৭৮০, ভাদ্র পৃঃ ১১৫-১২০।
৩৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
৩৭ ঐ ঐ ঐ ঐ

তারপর কাব্যের ভাষার প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্যের প্রশংসা করে, সমালোচক রঙ্গলাল কর্তৃক স্যার ওয়াল্টার স্কটের কাব্যের প্রারম্ভিক কলা কৌশল অনুসরণের উদাহরণ দিয়ে স্কটের তুলনায় রঙ্গলালের দৈন্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর রঙ্গলালের রচনার গুণের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : "কবিদিগের এক প্রধান লক্ষণ এই যে সদ্ভাবকে উজ্জ্বল ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেন ঐ ভঙ্গী সিদ্ধ করিতে কদাপি অর্থের কৌশল এবং কদাপি শব্দের কৌশল অবলম্বিত হয়। সাহিত্যকারেরা এই কৌশলদ্বয়কে অলঙ্কার শব্দে অবিধান করেন ···· প্রাচীন কবিরা অর্থালঙ্কারকেই শ্রেষ্ঠ মানিতেন, এবং তাহার প্রয়োগেও তাঁহারা বিশিষ্ট নিপুণ ছিলেন, আধুনিক কবিরা তাহার বিনিময়ে শব্দালঙ্কারের অনুরাগী হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহাদের কাব্যে অনুপ্রাস-যমকের সাহায্যে মনের পরিবর্তে কর্ণের বিনোদ অধিক হয়। সহৃদয় ব্যক্তিদের পক্ষে এ প্রথা কোন মতে আদরণীয় নহে ; এই প্রযুক্ত তাঁহারা প্রাচীন কাব্যেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন। ইহা উল্লিখিত করা বাহুল্য যে শব্দালঙ্কার সাবধানে স্থান বিশেষে প্রযুক্ত হইলে অতীব রমণীয় বোধ হয় ; পরন্তু মনুষ্যদেহের স্থানে স্থানে সঙ্গীতে অলঙ্কার না দিয়া সর্বাঙ্গ আভরণে আচ্ছাদিত করিলে যেরূপ সৌন্দর্যের হানি হয়, সেইরূপ অবিবেচনায় কবিতার সর্বত্র যমকের আবরণ হইলে রসের একান্ত ব্যাঘাত হইয়া থাকে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয় কবিদিগের যথার্থ প্রথা সাবধানে গ্রহণ করিয়া অর্থালঙ্কারের বাহুল্য প্রচার করিয়াছেন ; তত্রাপি তাঁহার গ্রন্থে শব্দালঙ্কারের অভাব নাই।"[৩৮] অতঃপর কাব্য থেকে উদ্ধৃতি-যোগে লেখকের বর্ণনা চাতুর্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত সমালোচক কবি কালিদাসের রচনার কথা উল্লেখ করেছেন, ভারতচন্দ্র ও কবি কঙ্কণের সাথে তুলনায় তাঁর ভাষার কিছুটা দৈন্যের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি যে চরিত্র চিত্রণে ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেক সার্থক তাও লেখক দেখিয়েছেন। এ ছাড়াও রঙ্গলালের কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে লেখক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মোট কথা, পদ্মিনীউপাখ্যানের দোষ গুণ বিশ্লেষণ করে তৎকালীন কাব্য-সাহিত্যে রঙ্গলালের যে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, তা 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'ই প্রথম দেখিয়েছে।

---

৩৮ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'—৫ম পর্ব। ৫৩ খণ্ড। শকাব্দা ১৭৮০, ভাদ্র, পৃঃ ১১৪-১২০

এমনি ভাবে মাইকেলের বিভিন্ন কাব্য, দীনবন্ধুর নাটক, টেকচাঁদের উপন্যাস ও বিহারীলালের কাব্য সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র পাতায় বেরিয়েছিল। সে আলোচনা কোথাও বিস্তৃত যেমন—মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের আলোচনা, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের আলোচনা; আবার কোথাও সংক্ষিপ্ত যেমন—টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালের' আলোচনা, বিহারীলালের 'স্বপ্নদর্শন' ইত্যাদি কাব্যের আলোচনা। কিন্তু সর্বত্রই নির্ভুল রসজ্ঞানের পরিচয় রেখে যেতে পেরেছেন সমলোচক। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র পাতায় পাতায় সেদিন এমনি করে বাঙ্‌লা সাহিত্যের 'জনযাত্রার পথচিহ্ন' অঙ্কিত হয়েছিল। আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিকাশ-পর্বে এরূপ উচ্চমানের সমালোচনা কর্মের অবতারণা করে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের যে কল্যাণ করেছে, তার পরিমাণ নির্ধারণ করা খুব সহজ নয়। আজ একশত বছরেরও অধিক কাল পরে এ আলোচনার অনেকটাই আমাদের কাছে খুব আদরণীয় মনে না হলেও, সেদিনের বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা, পাঠকের রুচি, শিক্ষা ও মনোভাবের দৈন্যের কথা স্মরণ করলে অসামান্য বলে স্বীকার ক'রতেই হয়। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'ই বাঙ্‌লা সমালোচনা সাহিত্যের যথার্থ প্রবর্ত্তক বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। সত্য বটে ১৮১৯ সালে 'সমাচার দর্পণে' পুস্তক পরিচয় জাতীয় নিবন্ধ প্রকাশ হতে শুরু করে। কিছুকাল পরে গুপ্ত কবির 'প্রভাকরে' প্রাচীন কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ এবং ঐ সাথে পুস্তক-পরিচয় জাতীয় রচনা প্রকাশের প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু 'বিবিধার্থে'ই প্রথম যথার্থ সমালোচনা কর্ম শুরু হয়। সমালোচনা কার্যের মূল্য সম্পর্কে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'—সম্পাদকের যে বলিষ্ঠ চেতনা লক্ষ্য করা যায়, পূর্ব পূর্ব কোন পত্রিকার সম্পাদকের মধ্যে তা পাওয়া যায় না।

অবশ্য ইংরেজীতে বাঙ্‌লা গ্রন্থাদির অনেকটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বেশ কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছিল। এ ব্যাপারে The friend of India (quarterly series), Calcutta Review ইত্যাদি বিখ্যাত পত্রিকার ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখ যোগ্য। মনে হয় ১৮২৭ সালে The friend of India পত্রে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাসের' আলোচনাই এ ধরণের প্রথম সমালোচনামূলক যথার্থ রচনা।[৩৯]

---

৩৯ The friend of India (quarterly series); October 1825 pp. 289 দ্রষ্টব্য)।

তবে এ কথা নিশ্চিত, বাঙলাতে যথার্থ সাহিত্য সমালোচনা শুরু হয় 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে'র পাতায়ই। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' এ ব্যাপারে যে আদর্শ নিষ্ঠা, যে কর্তব্য বোধ, দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিল তা আধুনিক কালেও দুর্লভ। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রথম সমৃদ্ধির যুগে বাঙলা দেশে সুষ্ঠু সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তুলে, বাঙালী পাঠককে সুস্থ সাহিত্য চেতনা, নির্ভুল রসজ্ঞান ও রুচি বোধের অধিকারী করে গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব পালন করে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করেছে। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' তাই বাঙলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

—

## গ্রন্থপঞ্জী


১ মোহিতলাল মজুমদার : সাহিত্য-বিচার
২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন-স্মৃতি
৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা-সাময়িকপত্র ( ১ম খণ্ড )
৪ ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খণ্ড
৫ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত : বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ—১ম পর্ব
৬ " ঐ —২য় পর্ব
৭ " ঐ —৩য় পর্ব
৮ " ঐ —৪র্থ পর্ব
৯ " ঐ —৫ম পর্ব
১০ " ঐ —৬ষ্ঠ পর্ব
১১ " ঐ —৭ম পর্ব

১২ J. Long : Long's Returns ( 1859 )

এতদ্ব্যতীত পুরাতন 'Calcutta Review', রহস্য-সন্দর্ভ, ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা থেকে সাহায্য নে'য়া হয়েছে।

# বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিক্রমা

মুহম্মদ আবুতালিব

## অভিজাততন্ত্র বনাম গণতন্ত্র

রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন অভিজাততন্ত্র ( Aristocracy ) ও গণতন্ত্র ( Democracy ) আছে, ভাষাক্ষেত্রেও তেমনি অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সন্ধান মিলছে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, রাজনীতিক্ষেত্রেরই মত ভাষাক্ষেত্রেও যুগে যুগে গণতন্ত্রের কাছে অভিজাততন্ত্রের পরাজয় ঘটেছে। এ-ভাবে বৈদিক বনাম লৌকিক, সংস্কৃত বনাম পালি, পালি বনাম প্রাকৃত, এবং প্রাকৃত বনাম অপভ্রংশের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে।[১] বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত প্রত্যেকটি ভাষাযুগলের মধ্যে প্রথমটি অভিজাততন্ত্র এবং দ্বিতীয়টি গণতন্ত্রের প্রতীক এবং শেষোক্ত অপভ্রংশ ভাষা থেকেই আমাদের মাতৃভাষা বাংলার জন্ম হ'য়েছে বলে ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন।[২]

ঐতিহাসিকদের মতে, বাংলা ভাষার বয়স কম্‌সে কম দেড় হাযার বছরের কাছাকাছি।[৩] এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এইযে, এই সুদীর্ঘ দেড় হাযার বছরের ইতিহাসেও অভিজাততন্ত্র বনাম গণতন্ত্রের লড়াই চলেছে এবং প্রতিবারেই গণতন্ত্রের

---

১ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—আমাদের সমস্যা, পৃঃ ৯, ১৯৪৯ ইং

২ (ক) ঐ বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রাচীন খণ্ড, ১৯৬৩

(খ) ঐ বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, সা-প, শীত সংখ্যা, ১৩৬৫

৩ ঐ পূর্বোক্ত।

জয় ও অভিজাততন্ত্রের পরাজয় দিয়ে লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই লড়াইয়ের কাহিনী যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

## বাংলা ভাষার যুগ-বিভাগ

ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের মতে, বাংলা ভাষার ইতিহাস মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি যুগে ভাগ করা যায়, যথা,—

(ক) প্রাচীন যুগ ৬৫০—১৩৫০ ইং

(খ) মধ্যযুগ ১৩৫০—১৮০০ ইং

(গ) নব্যযুগ ১৮০০—

এই প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের মাঝখানে একটি সন্ধি বা শূন্যযুগেরও কল্পনা করা হয়েছে (১২০০—১৩৫০ ইং)। বলা বাহুল্য, এই যুগটি বাংলায় মুসলিম আগমন ও অধিকার কাল। এ-কালে দেশ অধিকার ও দেশে শৃঙ্খলা স্থাপন ক'রতে মুসলিম বাদশাহ্‌দের শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হয়। ফলে, উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন এ-সময়ে বড়ো একটা পাওয়া যাচ্ছেনা, তাই এই যুগকে 'শূন্যযুগ' ও বলা যেতে পারে।

## প্রাচীন যুগ

### চর্যাপদ ও তার উত্তরাধিকার

প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়; শুধুমাত্র 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা আশ্চর্যচর্যাচয়[৪] নামে যে প্রাচীন কলমী পুথিখানিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কল্যাণে আমরা প্রাচীন বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা বলে জানতে পেরেছি, দুর্ভাগ্যক্রমে সহস্রাধিক বৎসর অবধি প্রবাস-জীবন যাপন করার ফলে সে ভাষা আমরা এক রকম ভুলেই বসেছিলাম! তাই চর্যার ভাষাকে আমাদের ভাষার প্রাচীনতম

---

৪ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত—"হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা", বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৩২৩—১৯১৬ ইং

নমুনা বলে গ্রহণ করে তার সংগে আমাদের প্রাচীন ভাষা ও ছন্দের মিল খুঁজতে গিয়ে অনেকেই গলদঘর্ম হ'চ্ছেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তী "শ্রীকৃষ্ণকীর্তণ" এর সংগে তার ভাষা ও ছন্দের দুস্তর ব্যাবধান দেখে ভাষাতত্ত্ববিদরা রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ ক'রছেন।[৫] তবে কি "চর্যাপদ" ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তণে"র মধ্যবর্তীকালে একটি 'শূন্যযুগ' বিরাজ করছে? বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের এই মাঝখানের পাতাগুলিকে কে ছিঁড়ে নিয়ে গেল?

সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার রীডার আর্ণল্ড বাকে (১৯৫৫ ইং) নেপাল থেকে কুড়িটি আধুনিক লোক-গীতি ("চাচা"গীতি) তাঁর টেপরেকর্ডার মারফত রেকর্ড ক'রে নিয়ে গিয়েছেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ পরলোকগত ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই গীতিগুলির ভাষা ও ছন্দের সংগে প্রাচীন চর্যাগীতির ভাষা ও ছন্দের মিল দেখে দাবী ক'রেছেন যে, সেগুলি "চর্যাগীতি" ও "শ্রীকৃষ্ণকীর্তণে"র মধ্যবর্তীকালের অর্থাৎ শূন্যযুগের বাংলা ভাষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এগুলি ছাড়াও নেপাল-তিব্বতের তালপাতের পুথি ঘেঁটে পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ণ কিছু লোক-গীতি উদ্ধার ক'রেছেন, যার সংগেও প্রাচীন চর্যাগীতির ভাব ও ভাষার আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। তার একটি গান এইরূপ,—

মেহেলি চণ্ডালী ঘরবি বাম্হণ
জগ বিটালস্তি তে তুই লাম্বন।
হল সহি কামঙ্কি আচাভূঅ দিট্‌ঠা
বাম্হণ মনুস চণ্ডালি এঁ তুট্ঠা।
অইসি নিরাজ কমাল ন দিশই
মাউগ চণ্ডালী বাম্হণে পই সই।
দেখু চণ্ডালীর বাম্হণ জার
পাঞ্চ বাম ভইল্ল একাকার।

---

[৫] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ সাল=১৯৫৯ ইং পৃঃ ১৬৪।

তে দুই নাসন্তি সম-স ঁাজোএ
ভণই বিনয়শ্রী সদগুরু-বোহে ॥

এতে কাহ্নপা'র চর্যাগীতির প্রতিধ্বনি মিলে।[৬]

আশ্চর্যের ব্যাপার, বাঙ্‌লা দেশ থেকে চর্যাপদ বা তার সমকালের বাংলা ভাষার কোনো নমুনা আবিষ্কৃত হ'চ্ছেনা। ভাষা-তত্ত্ববিদদের কাছে এও এক বিষম বিস্ময়ের বিষয়!

আমাদের পণ্ডিতকুল (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী) অবিশ্যি আমাদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, ভাষা-তত্ত্বের বিচারে চর্যাগীতি নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা। এর ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদির মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রম লক্ষিত হ'লেও মূলতঃ তা বাংলা ভাষারই পূর্বরূপ এবং বাঙালীরই নিজস্ব সম্পদ।

বাংলার ভগ্নিস্থানীয়া ভাষাভাষীরাও (যথা, অসমিয়া, উড়িয়া, হিন্দী, মৈথিলী ইত্যাদি) চর্যাপদকে অনুরূপভাবে তাঁদের ভাষার প্রাচীনতম নমুনা ব'লে দাবী ক'রছেন।[৭] অবিশ্যি এঁদের প্রত্যেকেরই দাবীর যুক্তিযুক্ততা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না, কেননা একই মূল উৎস থেকে এই সকল ভাষাই উৎসারিত হ'য়েছিল, তাই সকলের চেহারার সাদৃশ্য থাকা তো স্বাভাবিক। তবে বাংলা ভাষার সংগে তার যেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও মিলের ভাব বর্তমান তাতে বাংলা ভাষার দাবীই অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হ'তে পারে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও একটি প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট হ'চ্ছেনা, বাঙলা দেশেই যদি তার জন্ম, তবে বাঙ্‌লা দেশ থেকে তার বংশ লোপ পেলো কি ক'রে? ভুলেও কি এ দেশবাসীরা তার একটি চরণও রক্ষা করেনি? এর জবাবে সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে, বাঙ্‌লা দেশে মুসলিম আক্রমন ও রাজ্যবিস্তারের ফলে এ-দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি ধ্বংসের মুখে পতিত হ'য়েছিল; মুসলিম বাদশাহ্‌রা পরবর্তীকালে

---

৬ ডক্টর সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৮৮, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৯ ইং।

৭ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৩ ইং পৃঃ ১৭৬-৭৭

তার কথঞ্চিত ক্ষতিপূরণ ক'রতে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন বটে, তবে সে ক্ষতিপূরণ কোন দিনই সম্ভব হয়নি।[৮] পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যদি নেপালের রাজদরবার থেকে এই চর্যাগীতিগুলি উদ্ধার ক'রে না আনতেন, তবে হয়ত আমরা এই যুগের কোনো সন্ধানই পেতাম না। কিন্তু প্রশ্ন এই—চর্যাগীতিগুলিকে সুদূর নেপাল-তিব্বতে নিয়ে গিয়েছিলো কা'রা এবং কেন ? বাঙ্‌লা দেশে যে তার নমুনা মিলছেনা তার কারণ তো অজ্ঞান নয় !

মুসলিম আগমনের বহু পূর্বে পাক-ভারতব্যাপী কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য প্রমুখের নেতৃত্বে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান আন্দোলন শুরু হ'য়েছিলো, তার ফলেই না নির্যাতিত বৌদ্ধ সম্প্রদায় দেশত্যাগ করে নেপাল-তিব্বতে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন ? চর্যাপদের স্রষ্টারা তার সংগে অনেকেই এ দেশ ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন,—এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। এর পরে যাঁরা এ দেশে ছিলেন তাঁরাই না 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থে উল্লিখিত সদ্ধর্মী বা রামাঈ পণ্ডিতের নির্যাতিত শিষ্য-সাগরিদগণ ? মুসলিম আগমনের অব্যবহিত পরে যে "শূন্যযুগের" কথা বলা হ'য়েছে, সে শূন্যতার মূলে একা মুসলিম অভিযানকে দায়ী কিছুতেই করা যায় না। বরং মুসলিম আগমনের ফলেই এ দেশে নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদ্বোধন হয়েছিল, 'শূন্যপুরাণে'র 'নিরঞ্জনের রুষ্মা,' অধ্যায়ে তার জ্বলন্ত বিবরণ পাওয়া যাছে।[৯]

## চর্যাপদের ভাষা

চর্যাগীতি সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা এইযে এর ভাষা শুধু বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনাই নয়—এর মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্রের বীজ। গণজীবন ও গণভাষার অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এর মধ্যে। এর তাত্ত্বিকতা এর উপরের আবরণ মাত্র। এই আবরণের তলদেশে যে জীবনের ইংগীত, সে জীবন তো নেহায়েত গণতান্ত্রিক।

---

৮ ডক্টর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—Origin of Bengali Scripts, p. 3, C. U (1919 A.c.)

৯ রামাঈ পণ্ডিত বিরচিত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শূন্যপুরাণ',

"এই গণতান্ত্রিকতা চর্যাগীতিকারদের আপন-জাত পরিচয় সঞ্জাত।"[১০] পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা এইযে, এই গীতি-সাহিত্যের জন্মভূমিই সে এবং পূর্ব পাকিস্তানের গণ-জীবন ও গণ-ভাষার আদিমতম নমুনা র'য়েছে চর্যাপদে।

চর্যাগীতির আদি কবি মীননাথ বরিশালের (বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের) বাসিন্দা, তাঁর একটি মাত্র গীতি "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের" টীকাতে উদ্ধৃত হ'য়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ তাঁকে বাংলা ভাষার আদি লেখক ব'লে শনাখ্‌ত ক'রেছেন।[১১] সর্বাধিক চর্যাপদের লেখক কানুপা বা কাহ্নপাদ ও তাঁর গুরু "জালন্ধরী পা" ওরফে 'হাড়িপা' ছিলেন সোমপুরী বিহারের বাসিন্দা। সোমপুরী বিহার বর্তমান রাজশাহী জিলার এলাকাধীন 'পাহাড়পুর' নামে পরিচিত। লোক-ঐতিহ্যের গোপীচন্দ্র-মানিকচন্দ্র গীতির সিদ্ধাহাড়া বা হাড়িপাই হ'লেন—কানুপার গুরু জালন্ধরী। বর্তমান উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের রঙ্গপুর-দিনাজপুর-রাজশাহী ও পূর্ব এলাকার কুমিল্লার ময়নামতীতে এঁদের বহু কীর্তিচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ধাম পা, ভদ্র পা ও মহীধর ছিলেন কানুপার সাক্ষাৎ শিষ্য। ধামপা'র জন্মস্থান ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে, চাটিল পা চট্টগ্রামের বাসিন্দা; তিলোপাও চট্টগ্রামের লোক। ডোম্বীপা ত্রিপুরা জিলার এক রাজপুত্র ও রাজা ছিলেন। তাই এ-কথা স্বভাবতঃই বলতে ইচ্ছে করে—সাবেক উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষাতেই চর্যাপদগুলি রচিত হ'য়েছিল।[১২] অদ্যাবধি এই সব এলাকার কথ্য-ভাষায় চর্যার ভাষার অত্যাধিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একটু নমুনা দিই—

'সাঙ্গা'— 'সাঙ্গনা' মারিস কেনে।
মোক মারিলু ভালে করিলু
ছাওয়াক কেনে মারিলু।
(রঙ্গপুরী লোক-গীতি)

'সাঙ্গনা' অর্থ সাঙ্গা বিবাহকারী স্বামী।

১০ সুরেন্দ্র চন্দ্র মৈত্র—বাংলা কবিতার নব জন্ম, পৃঃ ১১, ১৯৬২ ইং

১১ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌—বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রাচীন খণ্ড ২য় সংস্করণ, ১৯৬৩ ইং

১২ সৈয়দ মূর্তাজা আলী—চর্যাপদের ভাষা, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৭০=১৯৬৩ ইং

'উজাএ'— ব্যাঙ উজোয় চ্যাং উজোয়
থলসে বলে আমু উজোই।
( খুলনার প্রবাদ )

উজাত্র—অর্থ, উজান দিকে যাওয়া।

'রাতি'— রাতি হইল ফোয়া ফোয়া
কোকিল পড়িছিল ডালে লো
গাতোল গাতোল হিংলে বানু
চললো হাপন ঘাশে লো।
( খুলনা জিলার বিবাহ-গীতি )

'সামায়'— দোহাইল দুধ বানে সামায়লা
( সিলেট অঞ্চলের প্রবাদ )

তুং "দুহিল দুধ কি বেণ্টে সামায়" ( চর্যাপদ )

বলাবাহুল্য, নিম্নরেখ শব্দগুলি চর্যাপদের উত্তরাধিকার বহন করছে। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি 'সাহিত্য পত্রিকা'র পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সৈয়দ মুর্তাজা আলী সাহেব জানিয়েছেন যে, চর্যায় ব্যবহৃত নিম্নলিখিত শব্দগুলি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় তো ব্যবহৃত হয়ই, বিশেষ করে তাঁর জন্মভূমি সিলেটেও ব্যবহৃত হয়, যথা,—"রুখ ( কাষ্ঠ ), সাঙ্কম বা হাকম ( সেতু ), নাঠা ( নষ্ট ), উজাএ ( উজান দিকে যায় ), কাউয়া ( কাক ), সামায় ( ঢুকে ), বুড়াইল ( ডুবাইল ), খন্তা ( স্তম্ভ ), আলাজালা ( তুচ্ছ বস্তু ), ঘিন ( ঘৃণা ), উভায় ( দণ্ডায়মান হয় ), ফাড়িমু ( ছিন্ন করব ), খৈড়া ( খেলা ), সুতেলা ( শুইল ), ইত্যাদি।" বলাবাহুল্য, যশোর-খুলনা এলাকাতেও শব্দগুলির ব্যবহার আছে। পূর্ববঙ্গীয় ( উত্তর বঙ্গসহ ) ভাষার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য যা চর্যাপদে পাওয়া যাচ্ছে, সে হ'ল—নাস্তিবাচক বাক্যে ক্রিয়ার আগে 'না' এর ব্যবহার, যথা,—'ধরণ ণ জাই' অর্থাৎ ধরণ যায়না। আধুনিক বাংলায় এই 'না' ক্রিয়ার পরে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গীয় ও পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষায় এই 'না' ক্রিয়ার আগেই বসে—'না যাবো', 'না খাবো' ইত্যাদি। পশ্চিম বঙ্গীয় ভাষায় এই ধরণের ব্যবহার একেবারেই অনুপস্থিত। তাই চর্যাপদের ভাষার মূলে পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষা

ছিল বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের দাবী পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে, এ-কথা বললে অন্যায় বলা হয় না। আর তা ছাড়া—চর্যাকারদের জীবনের সঙ্গে 'নদীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ' দেখে নদীমাতৃক পূর্ব পাকিস্তানেই যে চর্যাপদের জন্ম হ'য়েছিল, এ কথা ভাবতে স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে।[১৩] এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত (রাহুল সংকৃত্যায়ণ উদ্ধৃত) নেপাল-তিব্বতীয় লোক-গীতির কথা বলা যেতে পারে। উক্ত লোক-গীতিতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে যা এখনও পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় ও উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। যথা,—'আচাভুঅ', 'গাউগ' ইত্যাদি। খুলনা জিলার একটি প্রবাদ নিম্নরূপ:—

"দেহে আচাভুয়ো শুনে আচামুহো
ঘর পোড়াতে পুড়ে গেল বাজার ব্যাচা গুয়ো।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চর্যাগীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নাথ-সিদ্ধাচার্যদের জীবন-কাহিনীমূলক যে গীতিকা (নাথ-গীতিকা) উদ্ধৃত হ'য়েছে, তার মূল উৎসও এই উত্তর ও পূর্ববঙ্গ (বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান)। সম্প্রতি এই শ্রেণীর যে প্রাচীনতম গ্রন্থখানি পাওয়া গেছে, তাও এই উত্তরবঙ্গের কবি শয়খ যাহিদ (শেখ জাহিদ) কর্তৃক রচিত। বইখানির নাম 'আগুপরিচয়', রচনাকাল ১৪২০ শক (=১৪৯৮ ইং)। বইখানি সম্প্রতি রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়ম কর্তৃক প্রকাশিত হ'য়েছে।[১৪] শয়খ যাহিদের 'আগু পরিচয়' একখানি সৃষ্টিতত্ত্ব মূলক কাব্যগ্রন্থ; ইস্‌লামী সুফীতত্ত্ব ও পাক-ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ যোগতত্ত্বের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে এই গ্রন্থখানিতে। আমাদের সামাজিক ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য তাই এ গ্রন্থ এক কৌতূহলজনক আবিষ্কার। শুধু তাই নয়, চর্যার 'সন্ধ্যা' বা 'আলো-আঁধারী' ভাষার নমুনা এই নাথ-গীতিকাতেও মিলে। ষোলো শতকের কবি শয়খ ফয়যুল্লাহ্‌র রচনা থেকে একটু নমুনা উদ্ধৃত করি:

"পথড়ীতে পানি নাই পাড় কেন ডুবে।
বাসাঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন ওড়ে॥

১৩ সৈয়দ মুর্তাজা আলী—পূর্বোক্ত।

১৪ শেখ জাহিদ বিরচিত "আদ্য পরিচয়" মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী সম্পাদিত ও রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৫ ইং।

নগরে মনুষ্য নাহি ঘরে ঘরে চাল।
অন্ধলে দোকান দেয় খরিদ করে কাল॥"[১৫]

এই ভাষা ও ভাব-জীবনের ইশারা পরবর্তী সহজিয়া ও বাউল গীতি বহন করছে।

## শূন্য যুগের 'শূন্য পুরাণ'

দুর্ভাগ্যবশতঃ চর্যাগীতির অন্তর্ধানের পর বহুকালাবধি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়নি; তবে চর্যাগীতির পরে বাংলা ভাষার অগ্রগতি যে একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে যায়নি, তার প্রমাণ তেরো শতকের প্রারম্ভকালে রচিত "শূন্যপুরাণ"। "শূন্যপুরাণের" প্রাচীনত্ব নিয়ে পণ্ডিত-সমাজের মতভেদ যাই থাকুক না কেন, মুসলিম সংঘাতের ফলে এ-দেশের লোক-জীবন ও সমাজ-জীবন যে প্রবল বিস্ফোরণের সম্মুখীন হ'য়েছিল এবং তার ফলে এ দেশীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সাহিত্য নতুন রূপে আত্মপ্রকাশের পথ পেয়েছিল, 'শূন্যপুরাণে'র 'নিরঞ্জনের রুষ্মা" বা "কলিমা-ই-জালাল" (রুদ্র বাক্য) অধ্যায়টিতে তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। শূন্যপুরাণের ভাষায়ঃ

"এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
এ বড় হৈল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হইল খন্দকার (অন্ধকার)॥
ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথায়েত কালটুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥

---

১৫ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন—বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১০৫।

ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ভ হৈল্যা শুলপানি।
গণেশ হৈল্যা গাজি কাত্তিক হৈল্যা কাজি
ফকির হৈল্যা যত মুণি ॥

* * * *

আপুনি চণ্ডিকা দেবী তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নুর।
যতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে ক্যাড়া ফিড়া খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় হইল গণ্ডগোল ॥[১৬]

বলা বাহুল্য, মুসলিম আক্রমণ ও বাঙ্লা অধিকারের আগে থেকেই এ দেশে পীর-দরবীশদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে ; এই পীর-দরবীশরাই প্রকৃতপক্ষে এদেশে সমাজ-বিপ্লবের মূল কারণ। তাঁদের নিষ্কাম ধর্মসেবা ও পুত জীবনাদর্শ এ দেশে অমুসলিম জন-সমাজে জীবন-চাঞ্চল্য আনে। ইখ্তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খালজীর নেতৃত্বে মাত্র সতেরো জন বীর পুরুষ এ দেশ দখল ক'রতে যে সক্ষম হ'য়েছিলেন, তার কারণ যাঁরা বুঝতে পারেন না, বা বুঝতে চনে না, তাঁরা "শূন্যপুরাণ" খানি ভালো ক'রে পড়লেই, আশা করি, বুঝতে পারবেন।

"শূন্যপুরাণে" এ-কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হয়েছে যে, ধর্মপূজা প্রচার ক'রতে গিয়ে রামাঈ পণ্ডিতকে তিন তিনবার জনৈক হিন্দু রাজার 'ভূত' বা দূত কর্তৃক নির্যাতিত হ'তে হ'য়েছে। এই হিন্দু রাজার ভূতের অত্যাচারের কাহিনী নিশ্চয়ই মুসলিম বিজয়ের পূর্বের কথা। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেব মনে করেন, এই রাজা নিশ্চয়ই বল্লাল

---

১৬ রামাঞি পণ্ডিত বিরচিত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্যপুরাণ, পৃঃ ১৪১।

সেন।[১৭] ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী কর্তৃক সদ্ধর্মীদের প্রতি অত্যাচারের স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় এরূপ অনুমান করা যায়।

শূন্যপুরাণ যে শূন্যযুগেরই সৃষ্টি তার ভাষা ও ভাবাবহ থেকেও তার অনুমান করা যায়। এ গ্রন্থে সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবনের যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তা সংক্ষেপে এই—

(ক) জাজপুরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের অত্যাচারে ধর্ম ঠাকুর অতিষ্ঠ হ'য়ে মুসলমানের (যবন) রূপ ধরে তাদেরকে উদ্ধার করতে এলেন;

(খ) এই যবনেরা 'ঘোড়া'য় চড়ে 'কামান' হাতে নিয়ে এসেছিলেন;

(গ) এ-দেশীয় দেবতাগণ 'একমন' হ'য়ে আনন্দেতে ইজার (পা-জামা) পরা শুরু করলেন;

(ঘ) এদের মুখে 'দম্বদার' বা দম মাদার ধ্বণিও শোনা গিয়েছিল।

এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু রাজার অত্যাচারে অতিষ্ট দেশবাসী সে শাসনের অবসান কামনা করে ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলো। তাদের আহ্বানে ধর্মের পক্ষ হ'য়ে তাদেরকে উদ্ধার করতে ছুটে এসেছিল মুসলিম রাজশক্তি এবং পরে এঁদের ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে এ-দেশের দেবতাগণও আনন্দিত মনে 'ইজার' পরা শুরু করে দিয়েছিল অর্থাৎ মুসলমান হ'য়েছিল।

এই মুসলমানেরা 'দম্বদার' বা 'দম-ই-মাদার' ধ্বণি ক'রতেন। ঐতিহাসিক বিচারে 'দম-ই-মাদার' ধ্বণি চতুর্দশ শতকের আগের হ'তে পারে না। পাক-ভারতের বিখ্যাত দরবীশ হয্‌রত বদীউদ্দীন শাহ-ই-মাদারের ওফাত হয়—১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি ১২৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই হিসেবে তাঁর জন্মকাল ১৪৩৪—১২৪ = ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ। এই শাহ্‌-ই-মাদারের অনুসারীরা 'দম্বদার' ধ্বণি করতেন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, শূন্যপুরাণের এই অংশ পরবর্তীকালে রচিত হ'য়েছিল। কিন্তু তার প্রথম অংশ যেখানে ধর্মঠাকুরের আগমন ও হিন্দু রাজার 'ভূতের' উল্লেখ আছে সেটি নিঃসন্দেহে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্দ্ধের রচনা। কারণ এই শ্রেণীর রচনা সচরাচর ঘটনার অব্যবহিত পরেই রচিত হ'য়ে থাকে। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভকালেও

---

১৭ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, বাংলা সাহিত্যের কথা, নূতন সং, ১৩৬৩, পৃঃ ১০৫—১০

অবিকল এই ধরণের একটি ছড়া ইংরেজ রাজের আগমন কথা নিয়ে রচিত হ'য়েছিল। শুধু যবনরূপী ধর্মের বদলে সেখানে দেবতাগণের 'বৈকুণ্ঠে সাহেবরূপী' হওয়ার কথা আছে।[১৮]

শূন্যযুগের ভাষা ও সাহিত্যের নমুনা বিশেষ পাওয়া না গেলেও এই সময়ে রচিত ব'লে, 'শেক শুভোদয়া' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে কয়েকটি বাংলা ছড়া পাওয়া গেছে। তাতে হয্‌রত জালালউদ্দীন তাবরিযী সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ইনি সমসাময়িক কালের একজন বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক দরবীশ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত লৌকিক মঙ্গল কাব্য সমূহের আদি কবি যথা,—কানা হরিদত্ত, ময়ূর ভট্ট প্রভৃতির আবির্ভাব এই সময়ে হ'য়েছিল ব'লে অনুমিত হয়। বিশেষ ক'রে ঐ সব কাব্যের বিষয়বস্তু ও ভাবাবহের কথা বিবেচনা করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অসুবিধা হয় না। প্রসঙ্গক্রমে, মঙ্গল কাব্যের দেব-দেবীর ধর্মপ্রচারার্থে আক্রমাত্মক ভূমিকার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এই দেব-দেবীর সকলেই অন্ত্যজশ্রেণী থেকে উদ্ভূত এবং অভিজাত সমাজের বিরুদ্ধে তাদের উত্থান ও পূজা আদায় প্রচেষ্টার মধ্যে সমকালীন মুসলিম রাজশক্তির আগমন ও ইস্‌লাম ধর্মের পরোক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইতি-পূর্বে যারা অবজ্ঞাত, হীন ও অস্পৃশ্য ব'লে কীর্তিত হ'ত, ইস্‌লাম গ্রহণের ফলে তারা মুসলিম সমাজে প্রবিষ্ট হ'য়ে যে সামাজিক সাম্য ও ব্যক্তিগত অধিকারের স্বীকৃতি পেলো, তারই পরোক্ষ প্রভাবে এই অন্ত্যজ শ্রেণী-মানসে ব্যক্তি অধিকার আদায়ের স্বপ্ন দেখা দিয়েছিল কি না, এ-কথা কে বলবে? শুধু কি তাই? অতঃপর মুস্‌লিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও এই লৌকিক দেব-দেবীরা পূজা চেয়ে ব'সলো, এটিও কি কম কৌতূহলের কথা? ইসলামের আগমন না হ'লে এই লৌকিক মঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি কিছুতেই সম্ভব হ'ত না, এ-কথা জোর করেই বলা যায়।

এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় কি যে, বাংলা ভাষা দেশবাসীর পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে নবাগত বিভাষী, বিদেশী ও বিধর্মী রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত পালিত হ'ল। মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত ভিত্তিই গড়ে উঠল তাঁদের হাতে। এই রাজাবাদশাহ্‌রা সেদিন যদি বিদ্বেষ বশেই হোক, আর অবজ্ঞা বশেই হোক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে দূরে থাকতেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যত ছিল অকল্পনীয়।

১৮ ডক্টর সুকুমার সেন,—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৬।

## মধ্যযুগ

প্রথম পর্যায় : শাহী পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

(১৩৫০—১৭২০ ইং)

মধ্যযুগের প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙ্‌লা দেশে মুসলিম শাসনের ফলশ্রুতি হ'ল — সেকালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। যার শ্রেষ্ঠ ফসল—বড়ুচণ্ডীদাসকৃত "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ" ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন') ও বৈষ্ণব পদাবলী; শাহ মুহম্মদ সগীর কৃত "ইছুপ জলিখা" (য়ুসুফ ওয়া যুলায়খা); মালাধর বসু ওরফে গুণরাজ খানের "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"; যয়নুদ্দীনের 'রসূল-বিজয়'; কৃত্তিবাস ওঝার 'রামায়ণ', কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও কাশীরাম দাস বিরচিত 'মহাভারত', ও বিবিধ 'মঙ্গল কাব্য' ইত্যাদি। এই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রেছেন, মুসলিম আমীর-উমরাহ্‌রা। এবং আশ্চর্যের বিষয়, এই পৃষ্ঠপোষিত কবিগণ অধিকাংশই হিন্দুসম্প্রদায়ের লোক। সাহিত্য চর্চা তো দূরের কথা, ভাষায় ধর্মকথা শুনলেও যাঁদের 'রৌরব' নামক নরকগামী হওয়ার 'ফত্‌ওয়া' সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ঘোষণা ক'রেছিলেন।[১৯] এবং এই 'ফত্‌ওয়া' অমান্য করায় কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মত কবিকেও 'সর্বনেশে' আখ্যা লাভ করতে হ'য়েছিল। এই সব নেশের দল যদি সেদিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 'ফত্‌ওয়ার' ভয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা থেকে বিরত হ'তেন, আজ বাংলা সাহিত্যের কথা কল্পনাই করা যেত না।

আরও কৌতূহলের বিষয় এই যে, মুসলিম বাদশাহ্‌দের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির নামে হিন্দু-সাহিত্য তথা রামায়ণ-মহাভারত প্রীতির জন্য মুসলিম কবি-সাহিত্যিক সমাজও বিশেষ বিব্রত বোধ ক'রেছেন। ষোলো-সতেরো শতকের কবি সৈয়দ সুলতান তো বলেই ফেলেছেন :

"লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি॥
হিন্দু মোছলমানে তায় ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রছুলের কথা কেহ না সঙরে॥[২০]

---

১৯ ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন,— বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য।

২০ সৈয়দ সুলতান বিরচিত 'নবীবংশ' (ডক্টর এনামুল হক রচিত 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্যে' উদ্ধৃত)।

শুধু যে স্মরণ করেনা তা নয়, কবি মনে মনে ব্যথা অনুভব করেছেন এ-কথা ভেবে যে, মুসলমানী কথা-কাহিনী রচনার সমঝ্‌দার ও শাহী দরবারে মিলবে কি না! তাই বড় দুঃখেই তিনি লিখেছেন :

"ছৈয়দ সুলতানে কয় কেনে ভাবি মর।
সহায় রছুল যার তরিবে সাগর ॥"[২১]

অর্থাৎ পার্থিব পৃষ্ঠপোষক যদি নাই-ই মিলে তাতে ভাবনার কি আছে, আল্লাহ্‌-রসূল তো সহায় আছেন! কিন্তু লক্ষ্য ক'রবার বিষয় এইযে, সৈয়দ সুলতান মুসলমানী কথা-কাহিনী, তাঁর ভাষায়—'খোদা-রসূলের কথা', লিখলেন বটে, তবে তিনি দেশ-প্রচলিত রেওয়ায্‌ পরিত্যাগ ক'রলেন না, অর্থাৎ হিন্দুয়ানী রীতিতেই মুসলমানী কাহিনী রচনা ক'রলেন। তাঁর 'নবীবংশ' এই প্রেরণার ফল। 'নবীবংশ' নামটিও হিন্দুয়ানী 'রঘুবংশ' 'হরি-বংশ' ইত্যাদি নামের সমতালীয়। শুধু "নবীবংশ" কেন, "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" পাশে "রসূল-বিজয়", "মনসা বিজয়ের" পাশে "গাজীবিজয়", "গোরক্ষ বিজয়" নাম ও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তবে 'নবীবংশ' রচনার দ্বারা সৈয়দ সুলতান যে নতুন সাহিত্য ধারার সৃষ্টি ক'রতে চাইলেন, ধীরে ধীরে এই ধারা মুসলিম কবিদের দ্বারা এক বিশিষ্ট সাহিত্য-ধারায় রূপান্তরিত হ'ল, পরে এই ধারাতেই তথাকথিত দোভাষী বা মুসলমানী পুথি-সাহিত্যের জন্ম হ'ল, এরূপ অনুমান ক'রতে দোষ নেই। যথাস্থানে তার আলোচনা ক'রেছি। আগেই বলেছি, মধ্য-যুগের হিন্দু-মুসলিম কবিরা হিন্দুয়ানী বা মুসলমানী বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে সাহিত্য রচনা ক'রলেও রচনাদর্শের দিক দিয়ে তাঁরা একই পথের পথিক ছিলেন। আঠারো শতকের শাহ্‌ গরীবুল্লাহ্‌র পূর্ব পর্যন্ত শতাব্দীওয়ারী ভাবে তার নমুনা নিম্নরূপ :

ক "সব দেবে মিলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥

---

২১ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক—পূর্বোক্ত।

ইহার মরণ হএ কমন উপায়ে।
সব্বোই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাঁএ ॥
ব্রহ্মা সব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে।[২২]

খ "তিরতিএ পরণাম করোঁ রাজ্যেক ইস্বর।
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর ॥
রাজ রাজস্বর মৈদ্ধে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত ॥
মনুষ্যের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম্ম অবতার।
মহা নরপতি গোছ পিরথিম্বীর সার ॥[২৩]

গ প্রণমহোঁ নারায়ণ অনাদি নিধান।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় যত তাহার কারণ ॥
এক ভাবে বন্দোঁ হরি জোড় করি হাথ।
নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ॥[২৪]

ঘ ভাবে ভব কল্পতরু জ্ঞানে শুক্র মানে গুরু
ধ্যানে হর মহেশ সমান।
সান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্য্যাদার নাহি অন্ত
পীর সাহা মোহাম্মদ খান ॥
তান পদরজ পঙ্ক ভালে তিল পরি রঙ্গ
কহে জৈনুদ্দীন ইহলোকে।
জয় দিব নিরঞ্জণ ধর গিয়া সে চরণ
কোন শোকে ভাব মন দুখে ॥[২৫]

---

২২ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত বড়ুচণ্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন', পৃষ্ঠা ১
২৩ শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইছুপ জলিখা; ( রচনা—১৩৮৯—১৪১০ ইং )
২৪ মালাধর বসু বিরচিত —শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ( রচনা ১৪৭৩—১৪৮০ ইং ) পৃষ্ঠা
২৫ যয়নুদ্দিন বিরচিত 'রসুল বিজয়' কাব্য ( ১৪৭৪—১৪৮১ ইং )

এর পাশে গরীবুল্লাহ্ প্রবর্তিত মুসলমানী বা চলিত বাংলার উদ্ধৃতি দিলেই এই উভয় রচনা ধারার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হবে—

"হানিফা কহেন বুড়ি কহ সমাচার।
যার তরে গেলে কহ কি হইল তার ॥
বুড়ি বলে ভাল কামে পাঠালে আমায়।
জেওর তফাৎ থাক জান বাঁচা দায় ॥

*　　*　　*　　*

আশা করে মোর তরে করিলে উকিল।
ভাদ্দুরে তালের মত মারে কত কিল ॥[২৬]

এ ভাষা পূর্ববর্তী ভাষা-রীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এ কথা বলা বাহুল্য। শুধু তাই নয়, এ ভাষা সমকালীন বাঙালী সমাজের ঘরোয়া ভাষা। এই অংশে 'কাজ' অর্থে 'কাম' শব্দের এবং 'ভাদ্দুরে তাল' এর প্রয়োগ শুধু সমকালীন বাংলা ভাষায় বিস্ময়কর নয়—বিপ্লবাত্মক। গরীবুল্লাহ্র রচনা-রীতির আলোচনা কালে এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

গরীল্লবুাহ্র সমসাময়িক কবি হায়াত মাহ্মূদ ওরফে 'হেয়াত মামুদের' ভাষাও ছিল গণতান্ত্রিক অর্থাৎ ঘরোয়া বাংলা। তবে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের কবিরা বরাবরই একটু রক্ষণশীল, তাই তাঁদের ঘরোয়া ভাষাতে রাজধানী মুর্শিদাবাদ তথা পশ্চিম বঙ্গের সমকালীন ঘরোয়া, আরবী-ফারসী প্রধান, বাংলা ভাষার প্রভাব পড়তে বেশ দেরী হ'য়েছিলো। তাই হায়াত মাহ্মূদের কাব্যভাষা গণভাষাভিত্তিক হ'লেও গরীবুল্লাহ্র ভাষা থেকে তার পার্থক্যও ছিল সুস্পষ্ট। গরীবুল্লাহ্ ও হায়াত মাহ্মূদ উভয়েই জাতীয় তাহযীব-তমদ্দুন বিষয়ে সচেতন ছিলেন; তাই মুসলমানীর নামে,

---

২৬ শাহ গরীবুল্লাহ্ বিরচিত "সহি বড় সোনাভান" (রচনা —১১২৭ সাল = ১৭২০ ইং)।

সৈয়দ সুলতানের মত, হিন্দু দেব-অবতারকে মুসলমানের "নবী" বলে চালাতে যাননি। সৈয়দ সুলতান তাঁর 'নবীবংশে' কতিপয় হিন্দু দেব-অবতারকে, যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি, মুসলমানের নবীদের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। হায়াত মাহ্‌মূদ কিন্তু তা দেন নি—তাঁর 'আম্বীয়া বাণী'ই যতদূর জানা যায়, প্রথম বিশুদ্ধ নবী-কাহিনী (কাসাসুল আম্বীয়া)।[২১] তাই এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সৈয়দ সুলতান মুসলমানী সাহিত্য-চেতনার অগ্রদূত হ'লে, হায়াত মাহমূদ ও গরীবুল্লাহ্‌ যথাক্রমে মুসলিম ইতিহাস-চেতনা ও মুসলমানী ভাষা ও রূপ-চেতনার অগ্রপথিক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাই এই তিনটি নাম অবিস্মরণীয়।

### দ্বিতীয় পর্যায়ঃ শাহ গরীবুল্লাহ্‌ ও বাংলা ভাষা
### (১৭২০-১৮০০ ইং)

১১২৭ সালের মাঘ মাসে (১৭২০ ইং) রচিত "ছহি বড় সোনাভান" শীর্ষক পুথি-কাব্যে গরীবুল্লাহ্‌ এক অভিনব রচনাপদ্ধতি ও ভাবধারার প্রচার ক'রলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যধারা তথাকথিত 'দোভাষী' বা 'মুসলমানী পুথি-সাহিত্য' নামে নিন্দিত বা নন্দিত!

আপাতদৃষ্টিতে গরীবুল্লাহ্‌র রচনা-রীতিকে অভিনব এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যতিক্রম ব'লেই মনে হয়; কিন্তু একটু বিশেষভাবে দেখলে বোঝা যায়, গরীবুল্লাহ্‌র ভাষাদর্শই প্রকৃত বাংলা ভাষা—শত শত বৎসরের বাঙ্‌লার জনসাধারণের পিতৃ-পিতামহদের উত্তরাধিকার। এক কথায় বলতে গেলে, গরীবুল্লাহ্‌ সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম গণভাষার কবি, মৌলিক গণতন্ত্রী।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইতিপূর্বে প্রায় ছ'শ' বছর ধরে বাঙ্‌লা দেশে মুসলিম শাসন কায়েম ছিল এবং ইস্‌লামী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাহন ফারসী ভাষা এ-দেশে সরাসরি রাষ্ট্রভাষা না হ'লেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং মুঘল আমলে ফারসী ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপেই চালু হ'য়েছিলো;

---

২১ ক ডক্টর মহ্‌হারুল ইস্‌লাম সম্পাদিত 'হেয়াত মামুদ', পৃঃ ৩০৩, ১৯৬০ ইং।
খ ঐ সাহিত্য পথে, পৃঃ ৫৭, ১৯৬০ ইং

এ মতাবস্থায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল অধিবাসীর কাছে ফারসী ভাষা প্রায় দ্বিতীয় মাতৃভাষায় পরিণত হ'য়েছিলো। এমন কি 'মুঘল পাঠান হদ্দ হ'লে'ও বহুকালাবধি এ-দেশের জনসাধারণ "জোনাকীর বাতি"র মত ফারসীর চর্চা চালু রেখেছিলো বলে গ্রাম্য প্রবাদে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই গরীবুল্লাহ্‌র আবির্ভাব কালে বাংলা ভাষার যে রূপ চোখে পড়েছিল গরীবুল্লাহ্‌ তাকে তাঁর সাহিত্যের ভাষায় ধ'রে রেখেছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ও সাহিত্যে তার সুষ্ঠু ব্যবহারে গরীবুল্লাহ্‌র কৃতিত্ব কতখানি এর বিচার করতে গেলে শতাব্দীওয়ারী ভাবে তার ব্যবহারের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। এখানে পাঠকদের অবগতির জন্য সামান্য নমুনা পেশ করছি।

ক "আগে পাছে বান্দী সব বুড়া বিবি চলে।
এইরূপে ধাইয়া গেল বাহির দখলে॥
রহ রহ বলে হেথায় বেগমে।
বুড়া বিবি আসিয়াছে না দেখে চশমে॥[২৮]
(রচনা—১৪৯৪ ইং)

খ "ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পেগাম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাজ॥
দশবিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরান।[২৯]
(১৫৭৭ ইং)

২৮ বিজয়গুপ্ত বিরচিত "মনসা মঙ্গল", রচনা—১৪৯৪ ইং।

২৯ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, রচনা—১৫৪৪ ইং অথবা ১৫৭৭ ইং।

গ ভাগ গিয়া ......... এবে কিয়া করে আব।
হোগা হারামজাদ খানে খারাব॥
শোনতে হো দক্ষিণ রায় এসা দাগাবাজী।
বাঁধকে লে আনেসে তবে হাম গাজী॥
আদমীকু উপর রক্তায় হররোজ গাটা।
খাড়ার মুলুক লৌটে বড়ি বড়ি পাট্টা॥[৩০]
(রচনা—১৬৮৬ ইং)

ঘ বিবি বলে শরবৎ মৌজুদ আমার।
আনিতে দেরেজ মাত্র হুকুম তোমার॥
একেত সাহেব বড় আছিল পেয়াছা।
একদমে পিল সেই জহরের কাছা॥
যখন শরাব গিয়ে পেটেতে পড়িল।
আগুন সমান যেন জ্বলিয়া উঠিল॥[৩১]
(রচনা—আঠারো শতক)

ঙ মানসিংহ জোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে
কহে জাঁহাপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারি কিরামত॥

---

৩০ কৃষ্ণরাম দাস বিরচিত—"রায় মঙ্গল", রচনা—১৬৮৬—৮৭ ইং।

৩১ শাহ গরীবুল্লাহ্ কৃত "জঙ্গনামা"; রচনা—আঠারো শতকের প্রথমার্ধ।

হুকুম শাহনশাহী আরকিছু নাহি চাহি
জের হৈল নিমক হারাম।
গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম ॥[৩২]

এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, গরীবুল্লাহ্‌র বা ভারতচন্দ্রের কাব্যভাষা প্রাচীন বাংলা ভাষারই স্বাভাবিক বিবর্তিত রূপ। তবে এ কথা সত্যি যে, গরীবুল্লাহ্‌র আগে এই ভাষাকে কাব্য-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে কেউ অগ্রসর হন নি। পরবর্তী ভারতচন্দ্র প্রমুখ দু-একজন হিন্দু কবি গরীবুল্লাহ্‌র রচনাদর্শে আকৃষ্ট হ'য়ে কাব্য রচনায় অগ্রসর হ'লেও তাঁর অধিকাংশ অনুসারীই ছিলেন মুসলিম; তাই বোধ হয়, গরীবুল্লাহ্‌র রচনা-রীতির নাম প্রথমে 'দোভাষী পুথি', পরে 'মুসলমানী বাংলা' নামে পরিচিত হ'য়েছিলো। কিন্তু এ-কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, খ্রীষ্টীয় চৌদ্দ শতকের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বা 'ইছুপ জলিখা' কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ একরকম নেই বললেই চলে। পনেরো শতকের বিজয়গুপ্তের বা বিপ্রদাস পিপ্পলাইয়ের মনসামঙ্গলে বেশ কিছু সংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ দেখা গেল ষোলো-শতেরো শতকের কাব্যে বিশেষ করে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে-আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ বেশ সংযত ও সুষ্ঠু হ'য়ে এলো। কিন্তু সতেরো শতকের কৃষ্ণরাম দাসের "রায়মঙ্গলে" আমরা কি দেখলাম? বাংলা ভাষা যেন সেখানে হিন্দী-উর্দু শব্দের চাপে ম্রিয়মান হ'য়ে পড়েছে। এর পরের শতকে এলেন গরীবুল্লাহ্‌-হামযা। তাঁদের কাব্যে আমরা এই প্রয়োগকে এক নতুন মূর্তিতে দেখলাম। আমাদের পণ্ডিত সমাজ এর নাম দিয়েছেন "দোভাষী বাংলা"। কিন্তু কেন? খ্রীষ্টীয় চৌদ্দশ' সাল থেকে স্বাভাবিক নিয়মে বিবর্তিত হ'য়ে গরীবুল্লাহ্‌র হাতে এসে যে ভাষা সাহিত্যিক রূপ পেলো, তাকে কি 'দোভাষী' বলা সংগত? এমন কি একে "মিশ্র-বাংলা"[৩৩]

---

৩২ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বিরচিত – অন্নদামঙ্গল' (রচনা- আঠারো শতক শেষার্দ্ধ)

৩৩ ডক্টর আনিসুজ্জামান—সায়ের ফকীর গরীবুল্লাহ, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫= ১৯৫৯ ইং।

ও বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে এর নাম হওয়া উচিত 'চলিত বাংলা' ( ফারসী-تلیث বা ছলিছ )। বলা প্রয়োজন, এই রচনা-রীতির অনুসারীরা একে 'ছলিছ' ( বিশুদ্ধ ) ও 'চলিত' বাংলা নামে অভিহিত করেছেন।[৩৪] উনিশ শতকের আগে 'মুসলমানী বাংলা' শব্দটির ব্যবহারও ছিল না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গরীবুল্লাহ্ এই সাহিত্যের নব রূপায়ণ কালে প্রচলিত বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে অস্বীকার না ক'রে মূলতঃ সেই ভাষার রচনা-রীতির আদলেই কথ্যভাষার এই নব্যরীতির প্রতিষ্ঠা ক'রলেন। এবং বলাবাহুল্য, শব্দপ্রকরণ, বাক্যগঠন রীতি ; ধ্বনি-বিন্যাস, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই সাধুভাষার অনুকূল রইল ; শুধুমাত্র শব্দ চয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। কিছু কিছু নতুন শব্দও তৈরী হ'ল। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—

ক আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য ; যথা,—
"হাশমতের সাথে চলে তামাম ফউজ।
দরিয়া উপরে যেন উঠিল মউজ॥

খ হিন্দী শব্দ, বিভক্তি ইত্যাদির প্রয়োগ ; যথা
মুঝে, তুঝে, এয়ছা, যেয়ছা, আভি, ভি, তক ইত্যাদি

গ হিন্দী শব্দের নামধাতু সৃষ্টি ; যথা—
"এয়ছা ভাতে কতদূর নেকালিয়া যায় ( < নিকাল ) ;
"ঢুড়িবেক ( < ঢুড় ) দুনিয়ার কুফর কমজাত" ;
খেলাইল ( < খিলানা ) খানাপিনা যেমন যাহার ; ইত্যাদি

---

৩৪ মালে মুহম্মদ, সয়ফুল মুল্লুক বদীউজ্জামাল পুথি, : ১

ঘ আরবী-ফারসী শব্দের নামধাতু সৃষ্টি ; যথা—
গোজারিয়া (< গুজর) গেল রাত হইল ফজর ;
চলেন রাহার পরে খোশালিত (< খুশহাল) মন।

ঙ বাংলা ও আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের অনুসর্গ ও উপসর্গরূপে ব্যবহার ; যথা,—

১) তরে—'আবু শামার তরে ( = আবু শামাকে)
কোথা না দিত ছাড়িয়া'।
'ফাতেমা বেটার তরে কোলেতে লইল'।

২) বরাবর—( উপমা ও গৌণ কর্ম বোঝাতে ) যথা—
আগ বরাবর, দূর বরাবর।

৩) খাতির ( উদ্দেশ্য বা গৌণ কর্ম অর্থে ) যথা—
'পোছে সাহা বিবির খাতির ( = বিবিকে ) ;
'কি খাতিরে আইলে হেথা ... ... ...

চ ফারসী বহুবচন 'আন' বিভক্তির ব্যবহার, যথা,—
"যতলোক ছিল তার সব হিন্দুয়ান" ;
নকীবান শাদবাদ পুকারিয়া বলে।

এতদ্ব্যতীত আরবী-ফারসী কিতাবের মত ডান দিক থেকে বা' দিকে লেখা ও পড়ার নিয়ম প্রবর্তন ও এই লেখকদের এক বৈশিষ্ট্য ব'লে মনে করা যায়।

অবিশ্যি নামধাতু সৃষ্টি ও তার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'মজুরিয়া' (< মজুর) আছে। 'বদলিয়া' (< বদল) ; কুলুপিল (< কুলুপ) শব্দাবলীর ব্যবহার ষোলো শতকের বাংলাতেও পাওয়া যায়। গৌণকর্ম বাচক অনুসর্গরূপে 'বরাবর' শব্দের ব্যবহার "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে"ও আছে। আর হাল আমলে মধুসূদন তো

সংস্কৃত শব্দ সহযোগে নামধাতু সৃষ্টি ক'রে অমর হ'য়েছেন। এই দিক দিয়ে গরীবুল্লাহ্‌র প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য অবিসংবাদিত।

গরীবুল্লাহ্ যদি নেহায়েত দুর্বল সাহিত্য স্রষ্টাই হ'তেন, তা হ'লে দু'শ' বছরেরও অধিককাল ধরে শত শত কবি তাঁর অনুসারী হবেন কেন? তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তিনিই একটি বিশিষ্ট ভাব-সম্প্রদায়ের (school of thought) সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, যা কালের গণ্ডী অতিক্রম করে অদ্যাবধি জীবিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, এ-সাহিত্য আযাদী-উত্তর কবি-সাহিত্যিকদেরকেও নব নব ভাবে উদ্বোধিতও করছে।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্যের ইতিহাস সমূহে গরীবুল্লাহ্‌র সাহিত্য-সাধনার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া না হ'লেও তিনি যে আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবি নামে পরিচিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের মত কবিকেও আকৃষ্ট ক'রতে পেরেছিলেন, এর চেয়ে বড় কৃতিত্ব আর কি হ'তে পারে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, ভারতচন্দ্র গরীবুল্লাহ্‌র রচনাদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হ'য়েই তাঁর 'যাবনী-মিশাল' রচনা-রীতির সৃষ্টি ক'রেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চোপরার একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি—

"Gharibullah's school influenced the writings of some of the Hindu poets belonging to West Bengal. It is quite natural that the best known Bengali poet of the 18th century, Bharat Chandra was indebted to these Muslim writers of his racy style" ৩৫

## 'বাঙ্গালা' বনাম 'চলিত (চলিছ) বাংলা'

আমাদের একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে, মুসলমানী পুঁথিকাররা অযথা আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের দ্বারা বাংলা ভাষাকে দুর্বোধ্য ও ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিলেন।[৩৬] শুধু তাই নয়, উনিশ শতকের মুসলিম লেখকরা বাংলা ভাষা জানতেন কিনা, এ নিয়েও অনেকে গবেষণা ক'রেছেন দেখা যায়। কিন্তু এই ধারণার মূলে কি কারণ থাকতে

---

৩৫ রবীন্দ্র চোপরা—"Sufi Poets of Bengal, The Islamic Review, Feb, 1960, p 11

৩৬ ডক্টর কাযী মোতাহার হোসেন, বাংলা সাহিত্য, এস, এম ইকরাম সম্পাদিত পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক-উত্তরাধিকার, পৃঃ ২১৭।

২৪৫৫

পারে তা বোঝা যায় না। অথচ মুসলমানদের বাংলা রচনার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা সামান্য খোঁজ খবরও রাখেন, তাঁরা জানেন,—ভাষা ও সাহিত্যকে সহজ সরল ও সাধারণের কথ্যভাষার অনুকূল রাখতে এই সময়ের মুসলিম কবি, সাহিত্যিক ও সমঝদারগণের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। নমুনা দিই—

ক "রঙ্গিন করিতে তুমি এই সে কাহিনী।
শক্ত শক্ত লফজ তুমি না লেখ আপনি॥
এমত না হয় যেন আমা সবাকায়।
মানে পুছে ফিরি মোরা পণ্ডিত সবায়॥[৩৭]

খ এ খাতেরে আমি হীন অধিন নাচার।
যাতে সহজেতে বোঝে লোক বাঙ্গালার॥
বাঙ্গালা জবানে আর চলিত ভাষায়।
লিখিতে করিনু শুরু ভাবিয়া খোদায়॥[৩৮]

গ এই পুথির সায়ের ছিল আগু জামানার।
সমস্কৃত সাধু ভাষায় হইল তৈয়ার॥
পড়িতে বুঝিতে লোকের বহুত কসেল্লা।
তে কারণে অধীন রচে চলিছ বাঙ্গালা॥[৩৯]

আসলে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনার মর্মকথাই ছিল—

'যাতে সহজেতে বোঝে লোক বাঙ্গালার'

এবং 'সে খাতেরে ·····বাঙ্গালা জবানে আর চলিত ভাষায়' কাব্য সাধনায় আত্মনিয়োগ

---

৩৭ মুনশী বেলায়েত হোসেন বিরচিত—'কেসানায়ে আজায়েব'

৩৮ মুনশী জনাব আলী বিরচিত 'তাজকিরাতুল আউলিয়া'

৩৯ মুনশী খালে মুহম্মদ বিরচিত—'ছয়ফল মুলুক বদীউজ্জামাল'।

ক'রেছিলেন তাঁরা। শেষোক্ত উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে, পূর্ব যমানার কবি আলাওলের গ্রন্থ সংস্কৃত-প্রধান সাধু রীতিতে রচিত হওয়ায় সাধারণ মুসলিম পাঠকদের বুঝতে বড় 'কসেল্লা' হয় বলে কবি 'ছলিছ' বা চলিত বাংলায় তার রূপান্তর করে প্রচার করেছেন। এর চেয়ে স্পষ্ট উক্তি আর কি হ'তে পারে ?

## কাব্য-ভাষার নব রূপায়ণ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, যতদিন অবধি মুসলমানরা তাঁদের আলাদা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সাহিত্য রচনায় অগ্রসর না হ'য়েছেন, ততদিন তাঁদের সাহিত্যের ভাষাও হ'য়েছে হিন্দুয়ানী অর্থাৎ পূর্ব-ধারার অনুসারী। কোনো কোনো কবি বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী[৪০] ভাষাও বলেছেন। শুধু হিন্দুয়ানী ভাষা নয়, হিন্দু পুরাণ-কাহিনীরও তাঁরা দ্বারস্থ হ'য়েছেন বিনা দ্বিধায়। তাই দেখতে পাই মুসলিম পীরের বন্দনায় তাঁরা বিনা দ্বিধায় লিখতে পেরেছেন—

"ভাবে ভব কল্পতরু জ্ঞানে শুক্র মানে গুরু
ধ্যানে হর মহেশ সমান।
সান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্য্যাদার নাহি অন্ত
পীর সাহা মোহাম্মদ খান ॥ (যয়নুদ্দীন)

মুসলমান কবির রাজ বন্দনাতেও পাই—

"রাজ রাজস্বর মৈদ্ধে ধাম্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নির্প জগতবিদিত ॥
('রসুল বিজয়,' পূর্বোক্ত)

---

৪০ মুহম্মদ কবীর বিরচিত "মধুমালতী" (আহমদ শরীফ সম্পাদিত)।
মোহাম্মদ কবীরে কহে সুরস পঞ্চালী।
আছিল ফারসী কিতাব করিলুঁ হিন্দুয়ালি ॥ (পৃঃ ৩০)

এই রূপকল্প একজন মুসলিম কবির কলমে নেহায়েৎ বে-মানান। হিন্দু পুরাণের 'কল্পতরু', 'শুক্র' গুরু বা 'হরমহেশ' আর যাই হোক, মুসলিম পীরের বিশেষণ হ'তে পারে না। শুধু তাই নয়—সতেরো শতকের বিখ্যাত কবি দৌলত উযীর বাহ্‌রাম খান তাঁর "লায়লী মজনু" কাব্যে লায়লীর রূপ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"সে সব সুন্দরী মধ্যে এক অকুমারী।
মর্ত্তেত নামিছে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী।
লায়লী তাহান নাম মালিক নন্দিনী।
পূর্ণ শশী জিনি মুখ জগত মোহিণী ॥
জিনিয়া বান্ধুলী ফুল অধর রঙ্গিমা।
রতিপতি ধণু জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা ॥[৪১]

এ কোন ধরণের মুসলিম জীবন-চিত্র? মুসলিম পীরকে হিন্দুর দেবতার সংগে তুলনা দেওয়া হ'চ্ছে, মুসলিম বাদশাহ্‌কে 'দেব অবতার' নামে অভিহিত করা হ'চ্ছে, মুসলিম নায়িকাকে 'স্বর্গ বিদ্যাধরী' ইত্যাদি বলে ডাকা হ'চ্ছে, একে কি মুসলিম সাহিত্য বলা যায়?

এর পাশে গরীবুল্লাহ্‌র সাহিত্য-শিষ্য সৈয়দ হামযার পীর-বন্দনার একটি নমুনা পেশ করা যাক ঃ

"আল্লার মকবুল সাহা গরীবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম ॥
আছিল রওশন দেল শায়েরী জবান।
যাহারে মদদ গাজী সাহা বড়ে খান ॥[৪২]

এই বন্দনা মুসলিম-রীতি সম্মত এবং অসুন্দরও নয়। বাংলা সাহিত্যে এই মুসলমানী রীতি-সম্মত কাব্য-ভাষা প্রয়োগ-পদ্ধতির প্রবর্তন শাহ গরীবুল্লাহ্‌র অন্যতম

৪১ দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান বিরচিত "লায়লী মজনু", (আহমদ শরীফ সম্পাদিত),
৪২ সৈয়দ হামযা বিরচিত "মধুমালতী"।

শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অবিশ্যি আমার বক্তব্য এই নয় যে, গরীবুল্লাহ্‌-পূর্ববর্তী মুসলিম কবিরা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি; তবে আমি বলতে চাই যে, সে কাব্যে মুসলমানী জীবন-চিত্র সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয় নি; বরং মুসলমানী কথা-কাহিনী হিন্দুয়ানী রীতিতে পরিবেশিত হ'য়েছে, যার ফলে রসাভাস দোষ ঘটেছে। হ'তে পারে, পূর্ববর্তী কবিরা অধিকতর শক্তিশালী, কিন্তু শেষোক্ত কবিরা অধিকতর আপনার, এ-কথা ভুললে চলবে না। এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের কবি জামালউদ্দিন যথার্থই বলেছেন:

"বাঙ্গালার সারি বাঙ্গালাতে ভালো আসে।
এ পর্য্যন্ত লেখা হইল বাঙ্গালার ভাসে॥
লেখা যাবে অখন জবানে মোছলমানী।
সৃষ্টিমতে পদ তার না হবে মিলানি॥[৪৩]

অর্থাৎ কবি বলতে চান যে, প্রচলিত অর্থে আমরা যাকে বাংলা ভাষা ব'লে থাকি তা আসলে হিন্দুয়ানী, মুসলিম তাহযীব-তমদ্দুনবিষয়ক রচনার জন্য তা উপযোগী নয়, সে জন্য "জবানে মুসলমানী' বা আরবী-ফারসী সমৃদ্ধ চলিত বাংলা ভাষার প্রয়োজন। কবি গরীবুল্লাহ্‌ এই ভাষারই ভিত্তি স্থাপন ক'রেছেন। অবিশ্যি কবির এই 'জবানে মুসলমানী' আসলে যাকে দোভাষী বলা হয়, তা ঠিক নয়—এ-ভাষা পূর্ব প্রচলিত সাধু বাংলা ও তথাকথিত দোভাষী বাংলার মধ্যগা। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, হিন্দু ও মুস্‌লিম জীবন-চিত্র সার্থকরূপে চিত্রিত ক'রতে গেলে এ দুই ধারার সমন্বয়-সাধন, অন্যথায় পৃথক পৃথক রচনা-শৈলী গ্রহণের প্রয়োজন। 'প্রেমরত্ন' কাব্যে এই উভয়বিধ ভাষাদর্শের প্রয়োগ পৃথক পৃথক ভাবে করা হ'য়েছে। নমুনা দিই—

একটি রূপ বর্ণনা:

**ক বাঙ্গালা ভাষা (হিন্দুয়ানী)**

কালোরূপ বটে ধণি কালোরে ভালই গণি
কালোরূপে আলো জ্যোতির্ম্ময়।

---

৪৩ জামাল উদ্দীন বিরচিত 'প্রেমরত্ন', রচনা—১২৬০ সাল=১৮৫৩ ইং
ও
মুহম্মদ আবুতালিব—"জামাল উদ্দীন ও প্রেমরত্ন", বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৫৯ ইং।

কালোরূপে বনমালী শ্রীমতিরে কুলে কালি
মজাইলে ব্রজে গোপীচয়ে ॥

খ 'জবানে মুসলমানী'

কালোরূপ বটে বিবি শুনহ কালোর খুবি
আমি কিছু প্রচারিয়া কই।
কালো ছিল এ সংসার কালো মাঝে ডিম্বাকার
ডিম্বমাঝে গোপ্তে ছিল ওই ॥
কালো রঙ্গে লা মাকান যেখানে নিলেক্ষ্যস্থান
প্রকাশ করিছে জ্যোতির্ম্ময়ে।
ঘোরনিশি কালো রঙ্গ দরশন সখা সঙ্গ
মেহেরাজে দিল দয়াময় ॥
কালো কদরের রাতি যে নিশি নূরানি জ্যোতি
হইয়াছিল প্রভাতে উদয়।
যে নারী সৌন্দর্য বেশ মাথে তার কালো কেশ
কালো বিনে শোভা নাহি পায় ॥
কালো গুণ বলা ভার কালোরূপ কোকিলার
যার রবে জাগে প্রেমানল।
লাইলী যে কাল রঙ্গ মজিয়া যাহার সঙ্গ
মজনু যে হৈয়াছে পাগল ॥ ইত্যাদি।[৪৪]

শুধু জামাল উদ্দীনই নয়, সমসাময়িক মুসলিম কবিদের ভাষাই ছিল 'জবানে মুসলমানী'। এবং বলা বাহুল্য, এ-সময়ে বিদ্যাসাগর—অক্ষয় দত্তের হাতে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জন্ম হ'লেও বাংলা কাব্যে তেমন কোনো প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব তখনও হয়নি। আধুনিক বাংলা কাব্যের আদিপিক মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচিত হয় জামাল

৪৪ পূর্বোক্ত।

উদ্দীনের 'প্রেমরত্নে'রও সাত বৎসর পরে কবি রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের বাউল কবিদের কাব্য-ভাষার আলোচনা ক'রতে গিয়ে সে ভাষাকে 'বাঙালীর দিন-রাত্রির ভাষা' নামে অভিহিত ক'রে বলেন যে, কবি মধুসূদন ইচ্ছে করলে সে ভাষাতে 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনা ক'রতে পারতেন ; এবং তা যদি করতেন, বাংলা ভাষার কোনো ক্ষতি হ'ত বলেও তিনি মনে ক'রতেন না।[৪৫] এই বাউলের ভাষা কেমন ? একটু নমুনা দিই—

"পড়রে দায়েমী নামাজ এ দিন হ'ল আখেরী।
মাশুক রূপ হৃদ-কমলে
দেখ আশেক বাতি জ্বেলে ;
কিবা সকাল কি বৈকালে
দায়েমীর নাই অবধারী ॥
সালেকের বাহ্যপণা
মজ্জুবী আশেক দেওয়ানা,
আশেক দেল করে ফানা
মাশুক বই অন্যে জানে না,
আশার ঝুলি ল'য়ে সে না
মাশুকের চরণ-ভিখারী ॥[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ অবিশ্যি লালনের এই শ্রেণীর গানের উদ্ধৃতি দেন নি, তবে তিনি সাধারণভাবে বাউল কবিদের ভাষাবিষয়ে ( তাঁর ভাষায়—'যারা হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে পড়ে নি' ) এই মন্তব্য করেছেন। এবং কৌতূহলের বিষয় এই যে, তাঁর উদ্ধৃতির প্রায় সব কটিই লালন শা'র গান থেকে দেওয়া হ'য়েছে। তাই বাউল গান বলতে তিনি যে লালন-শাহী গীতি বুঝেছিলেন, এ-কথা অনস্বীকার্য। সমসাময়িক মুসলিম কবিরাও ( যেমন জামাল উদ্দীন, নুরহানুল্লাহ্, মুহম্মদ যাতের,

৪৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,—ছন্দ, র—র, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৯

৪৬ খোন্দকার রফীউদ্দীন—ভাব সঙ্গীত, পৃঃ ১০৮, সংগীত সংখ্যা ৩৭, ১৩৬৪ সাল=১৯৫৭ ইং।

মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ মুনশী, জোনাব আলী প্রভৃতি ) এই কাব্য-ভাষারই অনুশীলনী করতেন। উনিশ শতকের শেষার্দ্ধের খাঁটি বা সাধুভাষার কবি মোজাম্মেল হক সাহেবও যে এই তথাকথিত মুসলমানী বাংলাতে কাব্য চর্চা করেছেন, এ বিষয়ে অনেকেরই হয়ত জানা নেই। পাঠকদের অবগতির জন্য কবি মোজাম্মেল হকের মুসলমানী বাংলার একটু নমুনা পেশ করি—

শুনহ মোমিনগণ যত মোছলমান।
কহি আমি আপনার নিজের বয়ান ॥
নদীয়া জিলার বিচে শান্তিপুর নামে।
আছএ সহর এক মসহুর আলমে ॥
সেই সহরের বিচে বসতী আমার।
তিন বেরাদর মোরা ফজলে খোদার ॥
সকলের ছোট আমি জানিবে সবার।

... ... ...

কহে মোজাম্মেল হক শান্তিপুরে ধাম।
ওয়ালেদ মরহুম যার নছিম উদ্দীন নাম ॥[৪৭]

মোজাম্মেল হক শুধু দোভাষী পুথিই লেখেন নি, তাঁর কাব্য-সাহিত্যের দুই তৃতীয়াংশই এই মুসলমানী বাংলায় রচিত। এবং প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার বিখ্যাত 'আলেফ লায়লা' কাব্য তিনি তাঁর স্বগ্রামবাসী কবি রওশন আলীর সংগে এজমালী ভাবে রচনা করেন ( ১৮৮৬ ইং )।[৪৮] এই সব কথা যখন ভাবি, তখন বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না, কবি নজরুল ইসলামের ইস্‌লামী গযল ও আরবী-ফারসী প্রভাবিত বাংলা কবিতার মূল উৎস কোথায় ?

আরও একটি কথা। ১৯৪০ সালে লাহোরে বিখ্যাত 'পাকিস্তান' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম কবি-সাহিত্যিকেরা কলকাতায় এক সম্মিলনে মিলিত হ'য়ে

---

৪৭ মোজাম্মেল হক—চাঁদরাশী ছায়েত নামা, পৃঃ ৫৩, ১৩০০ সাল – ১৮৯৩

৪৮ মুহম্মদ আবুতালিব—আলেফ লায়লা, মাহেনও, জুলাই, ১৯৬২ ইং

'রেনেসাঁ সোসাইটি' নামে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৩ সালে। এই সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যত সম্পর্কে যে ইশারা দেওয়া হয়, কবি জামালউদ্দীনের উপরিউক্ত উক্তির সংগে তার আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা বলেন ঃ

"Muslims should give up using Hindu mythology because Hindu myths can not express Muslim ideals neither do they conjure up ideas and images which the Muslims like. When the Muslims use the myths they merely copy the Hindus. It is necessary to seek myths in the ancient tales of the Muslims or in the puthies."[৪৯]

কথাটি হিন্দু-সাহিত্যিকদের জন্যও সত্যি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, উনিশ শতকীয় মুসলিম কবিদের এই জাতীয় চেতনাকে সেদিন উপহাস করা হ'য়েছে। পক্ষান্তরে যাঁরা হিন্দু-প্রভাবিত তথাকথিত সাধু বা খাঁটি বাংলায় সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হ'য়েছেন, তাঁরা প্রশংসিত ( ? ) হয়েছেন। এই প্রশংসা তাঁদের জাতীয় চেতনার জন্য নয়, পরানুকরণের জন্য। তাই দেখতে পাই, বিখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেনের প্রশংসায় বলা হ'য়েছে ঃ "জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালা অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ; ইহার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।[৫০]" কবি কায়কোবাদ সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা হ'য়েছে।

এই উক্তির বাইশ বছর আগে জামালউদ্দীন সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন:

'বাঙ্গলার সারি বাঙ্গলাতে ভালো আসে'।

এবং বাঙালী মুসলমানের জন্য 'জবানে মুসলমানী'ই একমাত্র উপযুক্ত সাহিত্যিক বাহন ![৫১]

---

৪৯ P. E. N. Publication—The Literary seene in East Pakistan, p 42, 1955

৫০ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—জমিদার দর্পন নাটকের সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, ১৮৭৩ ইং।

৫১ অবিশ্যি কেউ কেউ মধ্যযুগের 'ব্রজবুলি' ভাষার সংগে এই "জবানে মুসলমানী"র তুলনা করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন, ব্রজবুলির মতই বিশেষ সাময়িক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির

## নব্য যুগ

### ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও তারপর

### (১৮০০ ইং—)

মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ে (১৩৫০-১৭২০ ইং) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ছিল অভিজাত তন্ত্রের আশ্রিত। তাই সেকালের সাহিত্যের ভাষায় অভিজাত্যের ছাপও রয়েছে সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৭২০-১৮০০ ইং) এ-ভাষা অভিজাততন্ত্রের আওতামুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের আশ্রয় নেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পর্যায়ের শেষভাগে (১৭৫৭ ইং) বাঙ্‌লা দেশ পরদেশী ইংরেজ সরকারের করতলগত হয়। বাংলা ভাষা শেষবারের মত অভিজাততন্ত্রের কব্জায় বন্দী হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বিশেষভাবে গদ্য, এই অভিজাততন্ত্র আশ্রিত ফোর্টউইলিয়ম কলেজের সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিত ও ইংরেজ মনীষীদের দান। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ

"বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ভাসুর ও ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজেরহাতে এমন একটি পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই"।[৫২]

শুধু তাই নয়, ফোর্ট উইলিয়মী পণ্ডিতেরা তাতেও খুশী হ'লেন না; তাঁরা বাংলা ভাষা থেকে প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দাবলী, যা বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হ'য়ে গিয়েছিলো, তাও বিতাড়নের অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন। সজনীকান্ত দাসের ভাষায়ঃ "১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮

---

প্রয়োজনে "জবানে মুসলমানী"র সৃষ্টি হ'য়েছিল, তাই ব্রজবুলিরই মত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পরে তার বিদায় অনিবার্য হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, ব্রজবুলি মধ্যযুগের বৈষ্ণব ধর্ম প্লাবনে ভেসে আসা স্রোতের ফুল মাত্র। ফুল স্বল্পায়ু। কিন্তু "জবানে মুসলমানী" স্রোতের ফুলমাত্র নয়—মুসলিম সমাজ-জীবনের গভীর তলদেশে তার জন্ম; বৃটিশ আমলে দুষ্ট প্রতিকূল আবহাওয়ায় সাময়িক ভাবে তার দীপ্তি ম্লান হ'লেও তার ভবিষ্যত উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়, এ-কথা বললে বেশী বলা হয় না।

৫২. রবীন্দ্রনাথ, শব্দতত্ত্ব,— পৃঃ ।/০

খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালত সমূহে আরবী-পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, আরবী-পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধপদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ অভিধান রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী-পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন; ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হইয়াছিল।[৫৩]

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন এই পণ্ডিতকুলের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি। ১৮৩৩ সালে (তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে) তাঁর 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন G. C. M. (মার্শম্যান?)। বাংলা ভাষা থেকে আরবী-ফারসী শব্দ বিতাড়নের পরিকল্পনা যে কি সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে কার্যকরী করা হ'য়েছিলো তার একটি সুন্দর নমুনা এখানে মিলছে। মার্শম্যান মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার প্রশংসা ক'রেছেন এই ব'লে যে, তা 'বিশুদ্ধতম বাংলায় রচিত' (Written in purest Bengalee)। এই প্রসংগে তিনি এ-কথাও বলতে ভুলেননি যে, লেখক সুকৌশলে 'বিদেশোদ্ভুত' (foreign parentage) শব্দগুলি বর্জন করতে সক্ষম হ'য়েছেন।[৫৪]

এই 'বিদেশোদ্ভুত' শব্দাবলী যে আরবী-ফারসী তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এই পণ্ডিতকুলের অন্যতম পুরোধা ন্যাথনিয়েল হ্যালহেড সাহেবও, যিনি তখনকার দিনেও একখানি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করে বিখ্যাত হ'য়েছেন (১৭৭৮ ইং), স্বীকার করেছেন, সেকালের কথ্যভাষায় আরবী-ফারসী শব্দাবলীর অত্যন্ত প্রাধান্য তো ছিলই উপরন্তু যিনি কথ্যভাষায় যত বেশী আরবী-ফারসী

---

৫৩ সজনীকান্ত দাস— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৭-২৮।

৫৪ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিরচিত— 'প্রবোধ চন্দ্রিকা', ভূমিকা, ১৮৩৩ ইং।
"All words of foreign parentage, however, he has carefully excluded, which adds not a little value of the compilation."

শব্দের আমেয় দিতে পারতেন, তাঁকে তত বেশী বাহ্‌বা দেওয়া হত।[৫৫] হ্যালহেড কথিত কথ্য ভাষার উপরেই তৎকালীন তথাকথিত দোভাষী বাংলার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত সমাজ সেই সাহিত্যিক কথ্যভাষার মর্ম্মমূলেই আঘাত করেছিলেন। এর মূলে রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিলোনা, এমন কথা ভাবতে পারা যায় না।

মুসলিম কবিরা এই ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত ছিলেন ব'লেই হয়ত ফোর্ট ইউলিয়মে নব-নির্মিত বাংলা গদ্য থেকে দূরে অবস্থান করেছেন, শুধু তাই নয়, বাংলা গদ্যই তাঁরা বর্জন ক'রেছিলেন বলে মনে হয়। তা না হ'লে শত শত মুসলমান পদ্যলেখক থাকা সত্ত্বেও একজনও বাংলা গদ্যলেখক উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে আবির্ভূত হ'লেন না, এটি কি ক'রে হ'তে পারে! অবশ্যি উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে যে সব মুসলিম লেখক গদ্য রচনায় (সংবাদ পত্র সেবী সহ) অগ্রসর হন, তাঁদেরকে বাধ্য হ'য়েই নবনির্মিত গদ্যের আদর্শ অনুসরণ ক'রতে হ'য়েছে, কেন না, ইতিপূর্বে গদ্য বর্জন করার ফলে নিজস্ব কোনো রীতি তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন নি। মীর মোশাররফ হোসেন থেকে পাকিস্তান সৃষ্টিকাল পর্যন্ত গদ্যে তাই একই রীতি অনুসরিত হ'য়েছে। আযাদী উত্তরকালের মুসলিম গদ্য নব রূপায়নের পথে অগ্রসর হ'য়েছে। আরও মজার ব্যাপার এইযে, বাংলা গদ্য না লিখলেও বাংলা পদ্যকে অসাধারণ সারল্যে মণ্ডিত ক'রে গদ্যের বিষয়বস্তুকে তাঁরা পদ্যের মাধ্যমে প্রকাশ ক'রতে বদ্ধ পরিকর হ'য়েছেন বলে মনে হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, উনিশ শতকের মুসলিম কবিরা নীরস 'ধর্ম্মতত্ত্ব', জ্যোতিষ শাস্ত্র (সাহাৎনামা), স্বপ্নতত্ত্ব (খাবনামা), এমন কি 'গো-চিকিৎসা' (এলাজে গাও) সংক্রান্ত গ্রন্থ পর্যন্ত বাংলা পদ্যে রচনা করেছেন। পক্ষান্তরে তাঁদের প্রতিবেশী হিন্দু-সমাজ ফোর্ট উইলিয়মীয় পণ্ডিতকুলের অনুসরিত পথেই অগ্রসর হ'য়েছেন। বলা বাহুল্য, এই পথেই তাঁরা আধুনিক য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগে

---

৫৫ ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড তাঁর গ্রামারে বলেন, "At present those persons are thought to speak the compound idiom (Bengali) with the most elegance who mix with the pure Indian verbs the greatest number of Persian and Arabic nouns."

পরিচিত হ'য়েছেন। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নব্যধারা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান মন্থন ক'রে অমৃতের সন্ধান লাভ ক'রলো বটে, তবে ভাষার মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন ফারসী ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামী তাহ্‌যীব তমদ্দুনের মূল স্রোতচ্যুত হ'য়ে সে ক্ষতিগ্রস্তও কম হয়নি; পক্ষান্তরে এই ভাষা বর্জন ক'রে মুসলমানরাও জ্ঞান-বিজ্ঞান পথচ্যুত হ'য়ে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছেন। কিছু দেরীতে হ'লেও এ ক্ষতির খেশারত দিতে হ'চ্ছে আজ সারা জাতিকে। রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের মত ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমানকে লড়াই চালাতে হ'য়েছে—সারা উনিশ শতক ধ'রে। বিশ শতকের এই সপ্তম দশকেও 'হিন্দু বাংলা' (বাঙ্গালা) বনাম 'মুসলিম বাংলা'র লড়াই চ'লেছে। তার পরিণামে 'ইস্‌লামি বাংলা সাহিত্য'[৫৬] 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য'[৫৭] ইত্যাদি নামে বাংলা সাহিত্যের আলাদা আলাদা ইতিহাস লিখিত হ'য়েছে। অদূর ভবিষ্যতে 'হিন্দু বাংলা' ও 'মুসলিম বাংলা' ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। আজ বাংলা ভাষার চরম উন্নতির শিখরে ব'সেও তাই বিদগ্ধ ব্যক্তিগণকে বলতে শোনা যাচ্ছে—কলকাতা কেন্দ্রিক 'বাবু সংস্কৃতি', যার সঙ্গে দেশের প্রাণের যোগ 'স্বাভাবিক' হ'তে পারেনি—"তার অনেকটা আকস্মিক, অনেকটা স্বয়ম্ভু......কলকাতার দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাল দিয়ে পল্লী বাংলা দিনে দিনে পিছিয়ে পড়েছে। নবাবী আমলে শহর আর গ্রামের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিকটতর ছিল, সমৃদ্ধিগত পার্থক্য থাকলেও জাতিগত পার্থক্য ছিল না। কিন্তু ইংরেজ তৈরী কলকাতার সঙ্গে বৃহত্তর বাংলা দেশের যে ব্যবধান রচিত হ'ল তা কেবল গোত্রান্তর নয়—ধর্মান্তর ও বটে।[৫৮]

এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এই 'ধর্মান্তর' বাংলা সাহিত্যেও ঘটলো'। ফলে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার চেহারাও বদলে গেল; এই বদল এত দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হ'ল যে, মাঝখান থেকে তাকে বাঁধ দিয়েও ধ'রে রাখা গেলনা। ফোর্ট

---

৫৬ ডক্টর সুকুমার সেন — "ইসলামি বাংলা সাহিত্য",

৫৭ „ এনামুল হক— "মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য",

৫৮ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—বাংলা গদ্যের জাত বদল, মাসিক 'নতুন সাহিত্য' পুনর্মুদ্রন, মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ় ১৩৬১ পৃঃ ৭৭৪-৭৫।

উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে নবস্রোত প্রবাহিত হ'ল তার প্লাবনে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালী বাংলা'[৫৯] বালির বাঁধের মত ধ্বসে গেল ; 'হুতোমী বাংলা'[৬০] ও ঠাঁই পেলো না পরবর্তী কালে 'বীরবলী ঢঙ'[৬১] একে কোনোমতে একটা কিনারায় নামিয়ে দিয়েছে বটে ! এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আরবী-ফারসী বর্জিত যে পণ্ডিতি বা 'বাবু বাংলার' প্রতিষ্ঠা করা হয়, প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে ব্যবহৃত কথ্য বাংলা ছিল তার প্রতিবাদ। জামালউদ্দীনের 'প্রেমরত্নে' ও এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'য়েছিল ব'লেছি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আদর্শ বাংলা গদ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই বলে যে, তিনি বিদ্যাসাগর-রচিত ( সাগরী রীতি ) বাংলা ভাষা ও 'আলালের ঘরের দুলালে' ব্যবহৃত বাংলা ভাষার কোনোটিকেই 'আদর্শ' ব'লে মনে করেন না। এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করে তিনি "আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে" পৌঁছবার চেষ্টা করবেন।[৬২] কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনিও তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। ফলে, 'বীরবল'কে 'বীরবলী ঢঙে' বাংলা গদ্য রচনায় অগ্রসর হ'তে হ'য়েছে।

বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) ঠিকই বলেছেন : "ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়। এর উল্টোটি করতে গেলে মুখেই কালি পড়ে।" কিন্তু 'বীরবলী ঢঙ' সম্পর্কেও বলা চলে, কলকাতার ঠাকুর পরিবারে ব্যবহৃত কথ্য ভাষার উপরে রঙ ফলিয়ে তিনি যে অভিনব কথ্যভাষার আদর্শ খাড়া করেছেন, সাধারণ মুসলিম সমাজে তার ব্যবহার আদৌ নেই। মুসলিম সমাজের কথ্যভাষার সঙ্গে তার দুস্তর ব্যবধান ও রয়েছে। এ ব্যবধান কবে দূর হবে ? আদৌ দূর হবে কি ? বাঙ্‌লা দেশ যখন এক ছিল এবং হিন্দু-মুসলমানও একজাতি হওয়ার স্বপ্ন দেখতো তখনই যখন এ ব্যবধান দূর হয় নি, আজ দ্বিধাবিভক্ত বাঙ্‌লা দেশে, যেখানে আদর্শ ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র কায়েম হ'য়েছে, সেখানে এই মিলনের আশা সুদূর পরাহত নয়

---

৫৯ প্যারীচাঁদ মিত্রের— 'আলালের ঘরের দুলাল' ( ১৮৫৮ ইং )

৬০ কালী প্রসন্ন রায় বিরচিত-- "হুতোম প্যাচার নক্‌শা", ( ১৮৬৩ ইং )

৬১ প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল রচিত গ্রন্থের ভাষা।

৬২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— "প্যারীচাঁদ মিত্র" সাধক চরিত মালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪-৩৫।

কি? তবে ইতিহাসের সাক্ষ্য যদি মিথ্যা না হয়, তবে বলতে হবে 'বাংলা' ও 'চলিত বাংলা' ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রেরই মত দুই দেশের প্রতীক হ'য়ে থাকবে এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে তার ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে। বলা বাহুল্য, এই তথাকথিত 'চলিত বাংলা'ই মূল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উত্তরাধিকার হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানেই টিকে থাকবে।

## গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-পঞ্জী

### সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

১ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬৩
২ আবুতালিব, মুহম্মদ : বাংলা সাহিত্যের ধারা (প্রকাশিতব্য)
— : জামালউদ্দীন ও প্রেমরত্ন, বা-এ-প, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৫৯ ইং।
৩ আনিসুজ্জামান, ডক্টর : সায়ের ফকীর গরীবুল্লাহ্, সাহিত্য পত্রিকা। (বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫=১৯৫৯ ইং)
৪ আবদুল মান্নান, ডক্টর কাজী : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১ম খণ্ড, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৫ আলী আহসান সৈয়দ, সম্পাদিত : Literary scene in East Pakistan, P. E N, 1949
৬ ইকরাম, এস, এম, (সম্পাদিত) : পাকিস্তানের সংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, পাকিস্তান পাবলিকেসন্স
৭ এনামুল হক, ডক্টর মুহম্মদ : মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৫৭ ইং)
৮ গোলাম সাকলায়েন, ডক্টর : ফকীর গরীবুল্লাহ,
৯ — : বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য, ১৯৬৪ ইং বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১০ দীনেশ চন্দ্র সেন, ডক্টর : বঙ্গ ভাষা ও সহিত্য

১১ নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ১ম সংস্করণ

১২ বসন্ত রঞ্জন রায় ( সম্পাদিত ) : শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন

১৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : সাহিত্য সাধক চরিত মালা, ১ম—৯ম খণ্ড

১৪ — : ভারত চন্দ্রের গ্রন্থাবলী ( অন্নদা মঙ্গল )

১৫ মনসুর উদ্দিন, অধ্যাপক মুহম্মদ : বাংলা সাহিত্য মুসলিম সাধনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং

১৬ মযহারুল ইস্লাম, ডক্টর : হেয়াত মামুদ, ১৯৬০ ইং বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৭ — — : সাহিত্য পথে, ( ১৯৬০ ইং— ) গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা।

১৮ মূর্তাজা আলী, সৈয়দ : চর্য্যা পদের ভাষা, সা-প, শীত সংখ্যা, ১৩৭০—১৯৬৩ ইং।

১৯ মনীন্দ্র মোহন বসু : সহজিয়া সাহিত্য

২০ — : চর্য্যাপদ

২১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছন্দ র-র, ২১ খণ্ড,

২২ -- : শব্দতত্ত্ব

২৩ রফীউদ্দীন খোন্দকার : ভাব-সঙ্গীত, ১৩৬৪=১৯৫৭ ইং

২৪ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় : Origin of Bengali Scripts, 1919 C. U.

২৫ শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ : বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রাচীন খণ্ড, নূতন সংস্করণ, ১৯৬৩ ইং।

২৬ — : বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত সা-প, শীত সংখ্যা ১৩৬২=১৯৫৯ ইং।

২৭ — : আমাদের সমস্যা, ১৯৪৯

২৮ সজনীকান্ত দাস : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ।

২৯ সুকুমার সেন, ডক্টর : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্দ্ধ, ৩য় সং ১৯৫৯ ইং।

৩০ — : ইস্লামি বাংলা সাহিত্য বর্ধমান সাহিত্য সভা,

৩১ সুরেন্দ্র চন্দ্র মৈত্র : বাংলা কবিতার নব জন্ম, ১৯৬২ ইং।

৩২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় : হাজার বছরের পুরাণ বৌদ্ধ গান ও দোঁহা,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩=১৯১৬ ইং।

মূল গ্রন্থ ঃ


১ গরীবুল্লাহ্, শাহ্, — ছহি বড় সোনাভান, ১১২৭=১৭২০ ইং।

২ — — ছহি বড় জঙ্গনামা

৩ জামাল উদ্দীন — প্রেমরত্ন, ১২৬০=১৮৫৩ ইং।

৪ জোনাব আলী — তাজকেরাতুল আউলিয়া

৫ বিজয় গুপ্ত — মনসা মঙ্গল কাব্য, ১৪৯৪ ইং।

৬ বেলায়েত হোসেন, মুনশী — ফেসানায়ে আজাএব

৭ মোজাম্মেল হক — চাঁদ রাশি ছায়েত নামা, ১৩০০ = ১৮৯৩ ইং।

৮ — — আলেফ লায়লা, ১৮৮৬ ইং।

৯ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার — প্রবোধ চন্দ্রিকা, ১৮৩৩, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

১০ মালে মুহম্মদ, মুনশী — ছয়ফল মুল্লুক বদীউজ্জামাল।

১১ রামাই পণ্ডিত — শূন্যপুরাণ (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)।

১২ হামযা, সৈয়দ — ছহি বড় আমীর হামজা।


—

# ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

ডক্টর মযহারুল ইসলাম,

এম-এ ( ঢাকা ), পি-এইচ-ডি ( রাজশাহী) পি-এইচ-ডি (ইণ্ডিয়ানা)

প্রফেসর এবং অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ,

ও

ডীন, কলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডক্টর গোলাম সাক্‌লায়েন,

এম-এ ( ঢাকা ), পি-এইচ-ডি ( ঢাকা ),

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়,

এম-এ ( ঢাকা )

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহম্মদ আবুতালিব,

এম-এ ( ঢাকা ), সাহিত্য ভারতী ( বিশ্বভারতী ),

ফেলো, বাংলা বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

## এই সঙ্গে পড়ুন

বাংলা বিভাগ প্রকাশিত

## সাহিত্যিকী

শরৎ সংখ্যা—১৩৬৬। দাম ২'৫০

*ডক্টর মযহারুল ইসলাম রচিত*

### কবি হেয়াত মামুদ

আঠার শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হেয়াত মামুদের কাব্য ও জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা গ্রন্থ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি-এইচ-ডি উপাধির জন্য মনোনীত। দাম—১২'০০ টাকা

### কবি পাগলা কানাই

উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ লোক-কবি পাগলা কানাই-এর রচিত লোক-গীতির নির্ভরযোগ্য সংকলন এবং কবির জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য আলোচনা গ্রন্থ।

*ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান রচিত*

### আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, প্রথম খণ্ড

আধুনিক যুগের মুসলিম সাহিত্য-সাধনার বিস্তৃত পটভূমি এবং মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্যকৃতির সুষ্ঠু আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ। ১৯৬২-৬৩ সালের আদমজী পুরস্কার প্রাপ্ত দাম—১০'০০ টাকা।

*ডক্টর গোলাম সাকলায়েন রচিত*

### বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত রচিত যাবতীয় বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয়, ঐ সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমি এবং উহাতে আরবী, ফারসী ও উর্দু মর্সীয়া সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি-এইচ-ডি উপাধির জন্য মনোনীত। দাম ১০'০০ টাকা

**প্রাপ্তিস্থান :**

বাংলা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজশাহী।

ফারুক লাইব্রেরী,
সাহেব বাজার
রাজশাহী।

লাইব্রেরী
বিভাগ

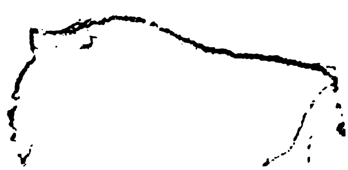

২৪৫৫

লাইব্রেরী

বিভাগ